নগ্ন নির্জন হাত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

NAGNA NIRJAN HATH

By Sayed Mustafa Siraj

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৯

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর : অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ : বিমল দাস

এক

মহাজাতি সদনে বিশ্বখ্যাত জাদুকর পি সি সরকারের তাকলাগানো ‘ইন্দ্রজাল’ দেখতে গিয়েছিলাম। শো ভাঙল রাত দশটা নাগাদ। গেট পেরিয়ে গাড়ির দিকে হাঁটছি, কেউ সম্ভাষণ করলেন—হ্যাল্লো মিঃ চৌধুরি !

জাদুর ঘোরে তখনও মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। তা ছাড়া রাস্তায় আলো কম। বললাম—আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না ?

—কী আশ্চর্য ! এই তো কিছুদিন আগে বোম্বেতে আমার ইণ্টারভিউ নিলেন আপনাদের দৈনিক সত্যসেবকের জন্য। ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন।—অবশ্য আপনারা সাংবাদিক। প্রতিদিনই কত রথী মহারথীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়। ইণ্টারভিউ নেন। আমি নেহাত এক ছন্নছাড়া ভবঘুরে। তবে আমার স্মৃতিশক্তি অত ঠুনকো নয়। দেখামাত্র চিনতে পেরেছি।

চলমান একটা গাড়ির এক ঝলক আলোয় চোখে পড়ল শক্তসমর্থ গড়নের লোকটি। চিবুকে তেকোনা দাড়ি। পরনে ফিকে লাল শার্ট এবং জিনস। বয়স পঁয়তিরিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি। বেশ স্মার্ট চেহারা। ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলে বললাম—থ্যাংকস। আজকাল সিগারেট খেলে বড্ড কাশি হয়। তো আপনাকে—

—আশা করি এবার মনে পড়েছে ?

—নাহ্।

—আমি ইন্দ্রজিৎ রায়। গালফ্ ওয়রের ধাক্কায় বাগদাদ থেকে জর্ডন হয়ে প্রথম যে ইণ্ডিয়ান টিমটি দেশে ফিরেছিল, তাদের লিডার ছিলাম আমি। এই বঙ্গসন্তান। এবার মনে পড়েছে ?

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। দৈনিক সত্যসেবকে খুব ফলাও করে ছাপা হয়েছিল ইন্দ্রজিৎ রায়ের বিবরণ। মরুভূমি পেরিয়ে পালিয়ে আসা দলটির নেতৃত্বে ছিলেন একজন বাঙালি। বড় রোমাঞ্চকর

সেই অভিযান। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পাঠকরা খুব খেয়েছিল প্রতিবেদনের সাক্ষাৎকারটি। বলা উচিত, খানিকটা রঙ চড়িয়েই লিখেছিলাম। ইন্দ্রজিৎ রায় অবশ্য কতটা রঙ চড়িয়ে ছিলেন, বলা কঠিন। কয়েকটা ফোটোও দিয়েছিলেন মরুভূমি আর ট্যাংক-বাহিনীর। তবে মোদ্দা কথাটা হল আমাদের কাগজের চড়া বাঙালিয়ানা। কর্তৃপক্ষ আমাকে বোম্বে পাঠিয়েছিলেন। ঝটপট হ্যাণ্ডসেক করে সহাস্যে বললাম—সরি মিঃ রায়! আসলে ইন্দ্রজাল দেখে বোধবুদ্ধি ঘুলিয়ে গিয়েছিল আর কি! আপনি বোম্বে থেকে কবে এলেন?

ইন্দ্রজিৎ বললেন—গতকাল। দিন দুয়েকের জন্য এসেছিলাম। আগামীকাল মর্নিং ফ্লাইটে ফিরে যাব। গালফ ওয়র তো চুপসে গেছে। আবার আরব মুল্লুকে পাড়ি জমাতে হবে। তবে বাগদাদে যাওয়া আর আপাতত সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না। অথচ দেখুন, আমার সর্বস্ব সেখানেই রয়ে গেছে। দেখা যাক্।

গাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বললাম—কলকাতায় উঠেছেন কোথায়?

—এণ্টালি এরিয়ায় আমার এক আত্মীয় থাকেন। বৃদ্ধ মানুষ। বিশাল বাড়িতে যখ হয়ে পাহারা দিচ্ছেন। ইন্দ্রজিৎ একচোট হাসলেন।—হানাবাড়ি মশাই! সম্পর্কে আমার জ্যাঠামশাই হন। ছেলেরা সব য়ুরোপ-আমেরিকায় সেট্ল্ করেছে। মেয়েরা দিল্লি-বোম্বে-বাঙ্গালোরে স্বামীদের ঘরকন্না করছে। যাক্ গে ও সব ফালতু কথা। ম্যাজিক কেমন দেখলেন বলুন?

—অসাধারণ।

—হ্যাঁ। তবে জুনিয়র সরকারের ওই কথাটা আমার বড্ড মনে ধরেছে। 'আজ যা ম্যাজিক, কাল তা সায়েন্স।' দারুণ বলেছেন না? সত্যি বলতে কী, এই প্রথম ওঁর ম্যাজিক দেখার চান্স পেলাম। জ্যাঠামশাই বলছিলেন, কলকাতা নাকি ভুতের শহর হয়ে যাচ্ছে। কে জানে! দশ-বারো বছর পরে ফিরে এসে আমারও বড্ড খারাপ লাগছিল জানেন? কিন্তু 'ইন্দ্রজাল' দেখার পর মনে হল, কলকাতা সত্যিই একটা জাদুনগরী।

ইন্দ্রজিৎ রায়ের কথাবার্তার ঢঙটি চমৎকার। মিঠে অন্তরঙ্গ হাবভাব

আকৃষ্ট করে। বোম্বেতে ওঁকে কেন যেন বাচাল মনে হয়েছিল। তবে তখন ওঁর ভূমিকা নিউজভ্যালুর দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই নিছক ব্যক্তি হিসেবে ওঁকে বিচার করার সুযোগ ছিল না। এতদিন পরে কলকাতায় শেষ মার্চের এক রাত্রে, ভদ্রলোককে ব্যক্তিগতভাবে জানার খেয়াল চাপল। নিজেকে 'ছন্নছাড়া ভবঘুরে' বললেন এবং আরব্যরজনীর সেই রহস্যময় বাগদাদ শহরে ছিলেন। সব মিলিয়ে ওঁর প্রতি একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। বললাম,—চলুন মিঃ রায়। আপনাকে পেঁছে দিই!

ইন্দ্রজিৎ কি তা-ই চাইছিলেন? অবশ্য এ কথাটা অনেক পরে মনে হয়েছিল। আসলে কোনও ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর আগেকার বহু ছোটখাটো ঘটনা চোখের সামনে বড় হয়ে আসে। ধরা পড়ে কতকগুলো পারম্পর্য। যাই হোক, উনি ঝটপট আমার গাড়িতে ঢুকে পড়লেন। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে কিছুটা এগিয়েছি, তখন বললেন—আপনি নিশ্চয় সাউথে, নাকি এণ্টালি এরিয়ায় থাকেন?

—না। সল্ট লেকে।

—কী সর্বনাশ! তা হলে মিছিমিছি আপনাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। তা ছাড়া ফুয়েলের যা দাম এখন!

—ও কিছু নয়। আমার বরং সুবিধেই হল। আপনাকে পেঁছে দিয়ে ইস্টার্ণ বাইপাস ধরব। জ্যাম থেকে বাঁচা যাবে।

ইন্দ্রজিৎ হাসলেন। কলকাতার জ্যামের চরিত্রই আলাদা। বিদেশের বেশ কিছু বড় শহরে আমি গেছি। জ্যাম হয়। তবে তা এমন বিশৃংখল নয়।

—বাগদাদে জ্যাম হয় না?

—হয়। আফটার অল প্রাচ্যের শহর। বিশৃংখলা আছে। কিন্তু আইন খুব কড়া।

—আপনি কী করে বাগদাদ গেলেন জানতে ইচ্ছে করছে?

ইন্দ্রজিৎ একটু চুপ করে থেকে আস্তে শ্বাস ছেড়ে বললেন—হঠাৎ একটা চান্স পেয়েছিলাম। আমার কমার্সের একটা ডিগ্রি ছিল। বোম্বেতে একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম ইরাকে কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিল। তাদের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট হয়ে বাগদাদে গিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎ

কিছুকালের জন্য বাহারিনের রাজধানী মানামায় বদলি করেছিল। কোথায় ইরাক, কোথায় বাহারিন! ইরাক মশাই মডার্নাইজড দেশ। আর বাহারিন কট্টর শেখদের রাজত্ব। একদিকে চূড়ান্ত ঐশ্বর্য, অন্যদিকে চূড়ান্ত দারিদ্র। জানেন তো? বাহারিন শুধু তেলের দেশ নয়, মুক্তোরও দেশ। পৃথিবীর সেরা মুক্তো পাওয়া যায় ওখানে। মুক্তো আর প্রবাল। সমুদ্রের খাড়িতে অঢেল ন্যাচারাল পার্ল পাওয়া যায়।

আপনি বাগদাদের কথা বলুন। আরব্যরজনীর সেই বাগদাদ এখন কেমন হয়েছে?

ইন্দ্রজিৎ একচোট হেসে বললেন—সেই বাগদাদ কোথায়? এখন একেবারে আধুনিক শহর। মধ্যে দিয়ে তাইগ্রিস বয়ে যাচ্ছে। হাজার বছর আগে বাগদাদ ছিল তাইগ্রিসের পূর্ব তীরে।

আচ্ছা মিঃ রায়, বাগদাদের মেয়েরা দেখতে খুব সুন্দর না?

—বুঝতে পারছি, অ্যারাবিয়ন নাইটস আপনাকে হন্ট করছে। মিঃ চৌধুরি, ক্যালকাটান নাইটসের মধ্যে আমি কিন্তু অ্যারাবিয়ান নাইটসকে ফিরতে দেখছি। আগে ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি, যখন কলকাতায় ছিলাম। দশবছর পরে ফিরে এসে এই বোধটা জেগেছে। রাতের কলকাতার চেয়ে রহস্যময় শহর কোথাও নেই।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করলাম, যতবার আমি ওঁকে বাগদাদের গল্প করতে বলছি, উনি পাশ কাটিয়ে কলকাতাকে এনে ফেলছেন। তাই চুপ করে থাকলাম।

মৌলালি সি আই টি রোড ধরে কিছুটা এগিয়ে উনি একখানে হঠাৎ বললেন—ব্যস! এখানেই নামিয়ে দিন। ডানদিকে মাত্র কয়েক মিনিট হাঁটলে আমার সেই জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা, চলি। নমস্কার!

কিন্তু ইন্দ্রজিৎ রায় গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে নামলেন না। উইন্ডোর কাচ নামিয়ে উঁকি মেরে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে বললেন—কলকাতাকে রহস্যনগরী বলছিলাম। তার একটা কারণ লোডশেডিং। সঙ্গে টর্চ নিয়ে বেরুনো উচিত ছিল। মিঃ চৌধুরি, যদি কিছু মনে না করেন, কাইন্ডলি আর মাত্র একটুখানি পথ—ওই

গলি রাস্তায় গাড়ি ঢোকার অসুবিধে নেই। আসলে গলিটা যেমন নির্জন আর অন্ধকার, বাড়িটাও তেমনি ভুতুড়ে। যদি প্লিজ—

হেঁ হেঁ করে অদ্ভুত হাসলেন ইন্দ্রজিৎ। বললাম—না, না। কোনও দ্বিধার কারণ নেই।

গাড়ি সামনের ক্রসিং দিয়ে আইল্যান্ডের ওপারে নিয়ে গেলাম। বাঁদিকে একটা গলিরাস্তা। হেড-লাইটে দুধারে জরাজীর্ণ পুরনো বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। একটু এগিয়ে বাঁক নিয়েছে গলিটা। বাঁকের মুখে বনেদি একটা বাড়ির গেট। ভেতরে বাগান-টাগান আছে। ইন্দ্রজিৎ বললেন—এই যে। এসে গেছি। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ চৌধুরি।

বলে চড়া গলায় ডাকলেন—মধু! মধু!

গেট খুলে মধ্যবয়সী একজন লোক বেরুল। তার হাতে একটা টর্চ। ইন্দ্রজিৎ গাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি ঢুকে গেলেন। মধু বলল—গাড়ি ঘোরানোর জায়গা আছে স্যার! ওই দেখুন!

টর্চের আলোয় সামনে একটুখানি পোড়া জমি দেখা গেল। সেখানে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আবার সি আই টি রোডে পেঁছিলাম। যেতে যেতে একবার মনে হল, ইন্দ্রজিৎ রায় কি কোন কারণে হঠাৎ ভয় পেয়েছেন? ভয়টা কি এই অন্ধকার গলিটার জন্য? তাছাড়া গাড়ি থেকে নেমেই বিনা সম্ভাষণে অন্তর্ধান!

কিন্তু এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মানে হয় না। আগামীকাল দুপুরে প্রেস ক্লাবে দলত্যাগী এক রাজনৈতিক নেতা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছেন। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, কভারেজ দিতে হবে কাগজে। তবে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' ধাঁচে। আজকাল রাজনীতিতে এমন সব লোক এসে জুটেছে, যাদের পাত্তা দেওয়াই বিপদ, না দেওয়াও বিপদ। কে কখন পাওয়ারে যাবে, কাগজের অর্থনৈতিক মানদণ্ড তার সঙ্গে বাঁধা।

সল্টলেকের ফ্ল্যাটে ফিরতে রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেল। খেয়ে দেয়ে গড়াতে যাচ্ছি, টেলিফোন বাজল। এ মুহূর্তে টেলিফোনের শব্দ বিরক্তিকর। অভ্যাস মতো ফোন তুলে বললাম—রং নাম্বার।

—রাইট নাম্বার, ডার্লিং?

এ পৃথিবীতে সস্নেহে নারীপুরুষ নির্বিকারে 'ডার্লিং' সম্ভাষণ করতে মানুষ একজনই আছেন। তিনি কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার। দ্রুত বললাম—সর্বনাশ!

—কারও সর্বনাশ কারও পৌষ মাস বলে একটা অনবদ্য প্রবচন আছে, জয়ন্ত। হ্যাঁ—পৌষ মাসটা তোমারই। সর্বনাশটা অবশ্য অন্যের।

—ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করুন প্লিজ! এত রাত্রে ফোন মানেই—

—মানেই সর্বনাশ! যাই হোক, কাল সকাল আটটায় চলে এস। তোমার কাগজের জন্য একটা এক্সক্লুসিভ স্টোরি পেয়ে যাবে।

—কিসের স্টোরি?

—এখন যার বাজারদর তুঙ্গে। মানে, খবরের কাগজের বাজারের কথা বলছি।

—ইলেকশন সংক্রান্ত তা হলে!

নাহ্। সকাল আটটায় অবশ্যই এসো। নৈলে পস্তাবে।

—হাই ওল্ড বস! জাস্ট্ একটু হিণ্ট্ না দিলে ঘুম আসবে না।

কর্নেলের চাপা হাসি শোনা গেল।

—ডার্লিং! তুমি যার লেজটা ধরেছিলে, তারই মাথাটা এবার ধরতে পারবে।

—ওঃ কর্নেল! প্লিজ নো হেঁয়ালি।

—আহা, বললাম তো! এনিওয়ে ছাড়ছি। হ্যাভ আ নাইস স্লিপ। গুডনাইট।

কর্নেল ফোন ছেড়ে দিলেন। অবশ্য এ কোনও নতুন ঘটনা নয়। রহস্যভেদী বৃদ্ধ নিশ্চয় কোনও জমজমাট রহস্য হাতে পেয়েছেন। কিন্তু আমি তার লেজ ধরেছিলাম মানে?

বিছানায় শুলাম বটে, ব্যাপারটা মাথার ভেতর মাছির মতো ভনভন করতে লাগল। অগত্যা আমার প্রিয় লেখক জর্জ সিমনোঁর গোয়েন্দা অমনিবাস পড়তে মন দিলাম টেবিলবাতির আলোয়।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল প্রায় পৌনে আটটায়। কর্নেলের কথা মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ঝটপট বাথরুম সেরে

যেমনতেমন একটা ব্রেকফাস্টের পর বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। ঘড়িতে তখন আটটা দশ বাজে। ইলিয়ট রোডে কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছুলাম সাড়ে আটটায়। আধঘণ্টা দেরি করে ফেলেছি। যে গতিতে গাড়ি চালিয়ে এসেছি, দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।

ঘণ্টা বাজাতেই ষষ্ঠীচরণ দরজা খুলে মুচকি হেসে চাপা গলায় বলল—বাবামশাইয়ের কাছে কে যেন এয়েছে দাদাবাবু! কেমন যেন চেহারা। ফকিরবাবাদের মতো নক্সা ডেরেস। মাথায় কাপড়ের সঙ্গে দড়ি বাঁধা।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম। সোফায় বসে আছেন দুজন ভদ্রলোক। তাঁদের একজন আরব—সেটা পোশাকেই বোঝা যাচ্ছে। বাঁকা বাজপাখি নাক। চিবুকে দাড়ি। অন্য ভদ্রলোককে বাঙালি বলে মনে হল। বেঁটে গাব্দাগোব্দা চেহারা। পরনে টাই-স্যুট।

কর্নেল ইংরেজিতে আলাপ করিয়ে দিলেন—শেখ জুবাইর আল-সাবা। বাহারিন থেকে এসেছেন। আর ইনি মিঃ হরনাথ চন্দ্র। প্রখ্যাত জুয়েলার চন্দ্র ব্রাদার্সের অন্যতম স্বত্বাধিকারী। জয়ন্তের কথা তো আপনাদের আগেই বলেছি। বসো, জয়ন্ত!

শেখ সায়েব তাঁর মাতৃভাষায় কী স্বগতোক্তি করে একটা ব্রিফ কেস খুললেন। তারপর একটা ফোটো বের করলেন। হরনাথবাবু তাঁর হাত থেকে সেটা নিয়ে আমাকে দিলেন। বললেন—দেখুন তো জয়ন্তবাবু, একে চিনতে পারেন নাকি?

ফোটো দেখে আমি একটু অবাক হয়ে বললাম—হ্যাঁ। চিনি। কিন্তু—

হরনাথবাবু মুচকি হেসে বললেন—আপনাদের কাগজে এই লোকটার ছবি বেরিয়েছিল। এই দেখুন!

বলে উনি ভাঁজ করে রাখা দৈনিক সত্যসেবকের পাতা খুললেন। আরও অবাক হয়ে বললাম—হ্যাঁ। ইন্দ্রজিৎ রায়। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলুন তো?

হরনাথবাবু বললেন—এই লোকটা বাহারিনের মানামা শহরে শেখ

সায়েবের জুয়েলারি কোম্পানির ম্যানেজার ছিল। গালফ ওয়রের হিড়িকের সময় কোম্পানির প্রায় দশ লাখ ডলার দামের মুক্তো চুরি করে পালিয়ে গিয়েছিল। শেখ সায়েবের সঙ্গে আমার বহু বছরের কারবার। এদিকে লোকটাও বাঙালি। তাই শেখ সায়েব কলকাতায় এসেছেন গতকাল। কথায় কথায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল, সত্যসেবক পত্রিকায় আরব মুল্লুক থেকে পালিয়ে আসা লোকজনের ছবি আর খবর বেরিয়েছিল। তবে আপনি বললেন, লোকটার নাম ইন্দ্রজিৎ রায়। না জয়ন্তবাবু! ওর নাম শংকর হাজরা। তবে সে-ও আসল নাম কি না বলা যায় না। তবে শংকর হাজরা নামেই শেখ সায়েবের কোম্পানিতে ঢুকেছিল।

শেখ জুবাইর আল-সাবা মাতৃভাষায় কী একটা বলে চাপা হুঙ্কার দিলেন।

রত্নব্যবসায়ী হরনাথ চন্দ্রের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম। কর্নেল একটু হেসে বললেন—কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুলো বলে একটা কথা আছে। কাজেই জয়ন্তের পক্ষে অবাক হওয়া স্বাভাবিক। ওর কাগজে যাকে হিরো করেছিল, সে এখন ভিলেন। ধাক্কাটা সামলানো কঠিন।

উত্তেজনায় নড়ে উঠলাম এবার। বললাম—কাল রাতে ইন্দ্রজিৎ রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

হরনাথ বললেন—কোথায়? কোথায়?

—মহাজাতি সদনে জুনিয়র পি সি সরকারের 'ইন্দ্রজাল' দেখে ফেরার সময়। তাকে আমি আমার গাড়ি করে এণ্টালি এলাকায় একটা বাড়িতে পেঁৗছে দিয়েছি। আজ মর্নিং ফ্লাইটে তার বোম্বে ফিরে যাওয়ার কথা আছে।

—বোম্বে ফ্লাইট? হরনাথ ঘড়ি দেখে হতাশ মুখে বললেন—তা হলে পাখি উড়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—ওই বাড়িতে গেলে তার বোম্বের ঠিকানা পাওয়া যেতেও পারে। তার এক জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি ওটা। বলে কাল রাতে যা ঘটেছিল, তার বিবরণ দিলাম।

হরনাথ ইংরেজিতে শেখ সাহেবকে কথাগুলো বলতেই উনিও

উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁত কিড়মিড় করে গর্জালেন—গিশ্‌! সারিক্‌! কনাব্‌!

বুঝলাম, আরবি ভাষায় মুণ্ডুপাত করছেন ইন্দ্রজিৎ রায় ওরফে শংকর হাজরার। বললাম—কর্নেল! আপনিও সঙ্গে চলুন।

হরনাথও বললেন—প্লিজ কর্নেল! আমি তো আপনারই সাহায্য নিতে যোগাযোগ করেছিলাম। জয়ন্তবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয়ের কথা জানতাম না। আপনি সেবার আমার হারানো হিরের নেকলেস উদ্ধার করে দিয়েছিলেন। সেই ঋণ জীবনে শোধ হওয়ার নয়। তবে এবারকার এই কেস আমার আরববন্ধুর হলেও আপনার সাহায্য চাইছি। ইনি বাংলা বোঝেন না বলেই এভাবে বলছি, ইনি বড্ড জেদি মানুষ। এঁদের দেশের লোকের স্বভাবচরিত্র অন্যরকম। উল্টো বুঝে ওই অঞ্চলে আমার কারবারি যোগাযোগ বন্ধ করে দিতে পারেন। বিশেষ করে ওখানকার শাসকপরিবারের দূরসম্পর্কের আত্মীয় উনি। খুব প্রভাবশালী লোক।

শেখ সাহেব ইংরেজিতে বললেন—আমার বন্ধু মিঃ চন্দ্র বলেছে, আপনি ফি নেন না। আপনি যোদ্ধা ছিলেন। যোদ্ধাদের প্রতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা আছে। আমরা আরবরা যোদ্ধার জাত। তবে বাণিজ্য আর যুদ্ধের সম্পর্ক আছে।

কর্নেল হাসলেন। ধন্যবাদ! বলে হরনাথের উদ্দেশে বাংলায় বললেন—এক মিনিট মিঃ চন্দ্র। দমদম এয়ারপোর্টে আমার স্নেহভাজন এক অফিসার আছেন। আগে জেনে নিই, ইন্দ্রজিৎ রায় বোম্বে ফ্লাইটের যাত্রী-তালিকায় কেউ আছে কিনা।

কর্নেল টেলিফোন ডায়াল করতে ব্যস্ত হলেন। আমরা দাঁড়িয়েই রইলাম। আমার তর সইছিল না। একটু পরে কর্নেল চাপা স্বরে তার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। একটা কথা কানে এল—একা এবং বাঙালি নামের কেউ…” উনি ফোন কানে রেখে আমাদের দিকে ঘুরে ফের বললেন—এক মিনিট!

কিছুক্ষণ পরে সাড়া দিলেন।—হ্যাঁ…আচ্ছা। ঠিক আছে। থ্যাংকস্‌ ডার্লিং। না, না। তেমন কিছু নয়। রাখছি।

হরনাথ বললেন—ইন্দ্রজিৎ রায়ের নাম আছে লিস্টে?

—নাহ্। কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন।—সিঙ্গল সিটের যাত্রীদের নামে কোনও কমন বাঙালি নাম নেই। তবে বলা কঠিন। নিছক নাম দেখে কেউ বাঙালি কি না জানা অসম্ভব। আসলে আমি জানতে চাইছিলাম ইন্দ্রজিৎ রায় নামটা লিস্টে আছে কিনা। কিংবা নামের আদ্যাক্ষর আই এবং পদবি রায় আছে কিনা। নেই।

বললাম—তা হলে ছদ্মনামে গেছে।

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন—যাই হোক। মিঃ চন্দ্র, আপনি আর শেখ সায়েব এখানে অপেক্ষা করুন। জয়ন্ত একা যাক্ ওই বাড়িতে। আপনি এবং বিশেষ করে শেখ সায়েব গেলে আপনাদের দেখে প্রতিবেশীদের কৌতূহল জাগতে পারে। সেই জ্যাঠামশাই ভদ্রলোকও ভড়কে যেতে পারেন। গত রাতে জয়ন্ত ইন্দ্রজিৎ রায়কে পেঁাছে দিয়েছে। মধু নামে যে লোকটির কথা বলল, সে ওকে চিনতে পারবে। কাজেই জয়ন্তের একা যাওয়াই উচিত। চিয়ার আপ জয়ন্ত! এটা তোমারই কেস কিন্তু। তোমারই হিরো ইন্দ্রজিৎ রায়। তুমিই কাগজে তার কথা লিখেছিলে তার জ্যাঠা-মশাই নিশ্চয় দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পাঠক। আঞ্চলিক ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক।

কর্নেল স্বভাবসিদ্ধ অট্টহাসি হাসলেন। হরনাথ বললেন—ঠিক ঠিক। আপনিই যান জয়ন্তবাবু! কর্নেলের কথায় যুক্তি আছে। আমরা আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।

উনি শেখ সায়েবকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলেন ইংরেজিতে। শেখ সায়েব মাতৃভাষায় বলে উঠলেন—না'মা! না'মা! মাসা! মাসা! যেতে আপত্তি করছেন ভেবে ইতস্তত: করছিলাম। শেখ সায়েব বললেন—দ্যাট্স্ রাইট। গো! গো!

একা যেতে অস্বস্তি হচ্ছিল বটে, কিন্তু আমার কাগজের পক্ষে একটা অসাধারণ স্কুপ নিউজ এটা। কারণ ইন্দ্রজিৎ রায়ের খবর দেশের বড়-বড় ইংরেজি কাগজেও বেরিয়েছিল, যদিও আমার স্টোরিটা ছিল সাক্ষাৎকার ভিত্তিক এবং এক্সক্লুসিভ বলা হয় যাকে। এবার হিরোকে ভিলেন বানিয়ে চমকে দেবার চান্স এসে গেছে হাতে। অন্ধকার রাতের লোডশেডিংয়ে দেখা জায়গাটা দিনের আলোয়

খুঁজে বের করতে সময় লাগল। দু'বার দুটো গলিরাস্তায় ঢুকে হন্যে হলাম। তৃতীয়বার সেই গলিরাস্তাটা খুঁজে পাওয়া গেল। বাঁদিকে বাঁকের মুখেই পুরনো বিশাল বাড়ি, সামনে গেট এবং ভেতরটা দেখেছি। এই গলিটাই বটে।

কিন্তু গলিতে ঢুকতে গিয়ে দেখি প্রচণ্ড ভিড়। মুখে-মুখে উত্তেজনা। এবং পুলিশ।

একদঙ্গল ছেলেছোকরা আমার গাড়ির কাছে এসে বলল—গাড়ি যাবে না দাদু! গাড়ি ব্যাক করুন।

মুখ বাড়িয়ে বললাম—কী হয়েছে? এত লোক কেন?

—একটা বডি পড়েছে দাদু!

—বডি পড়েছে তার মানে?

ওরা দাঁত বের করে হেসে অস্থির হল। একজন একটু ভদ্রভাবে বলল—সুইসাইড কেস স্যার! ওই যে বিল্ডিং দেখছেন। ওই বিল্ডিংয়ের দোতলায় বাথরুমে একটা লোক সুইসাইড করেছে। পাড়ার লোক নয় স্যার, আউটসাইডার।

চমকে উঠে বললাম—ওই গেটওলা বাড়িটায় নাকি?

—হ্যাঁ স্যার!

গাড়ি ব্যাক করে বড় রাস্তায় গেলাম। তারপর গাড়ি পার্ক করে চাবি এঁটে গলিতে ফিরে এলাম। ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে দেখি, অ্যাম্বুলেন্সে লাশটা সবে ঢোকানো হচ্ছে। চাদরে ঢাকা। পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে ভিড় হটাচ্ছে। একজন পুলিশ অফিসারকে আমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখিয়ে বললাম—কে সুইসাইড করেছে?

অফিসার হাসলেন।—আপনারা কাগজের লোকেরা কি মশাই বাতাসে গন্ধ শুঁকে টের পান? তবে অফিসিয়্যালি আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

—আমি শুধু নামটা জানতে চাইছি।

—কে এক ইন্দ্রজিৎ রায়। শুধু এটুকুই বলতে পারি।

—ইন্দ্রজিৎ রায় সুইসাইড করেছেন? আমার গলা কেঁপে গেল কথাটা বলতে। অফিসার ভুরু কুঁচকে তাকালেন।—চিনতেন?

—নামটা চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় যেন শুনেছি। মানে, আমরা

নিউজম্যান। কাজেই—

—তা আপনি মশাই খবর পেলেন কী করে? অফিসারের কণ্ঠস্বরে সন্দিগ্ধতার সুর শোনা গেল।

—দ্রুত বললাম মেইন রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম। এই গলিতে ভিড় দেখে চলে এলাম। আমি নিউজম্যান। বলে হাসবার চেষ্টা করলাম। জানেন তো? 'লজ্জা ঘেন্না ভয়, এই তিন থাকতে নয়' আমাদের বেলায় যতটা খাটে অন্যত্র নয়।

অফিসার অদ্ভুত হেসে বললেন—নেহাত স্যুইসাইড কেস মশাই! লোকটা নাকি বাউণ্ডুলে প্রকৃতির ছিল। আউট অব ফ্রাস্ট্রেশন গলায় দড়ি বেঁধে বাথরুমে ঝুলে পড়েছে। এ কোনও নিউজ নয়। রোজই একটা না একটা হচ্ছে। নানারকম টেনশন, ঝগড়াঝাঁটি, চূড়ান্ত হতাশা অ্যাণ্ড সো অন।

উনি জিপে গিয়ে বসলেন। কাছে গিয়ে বললাম—একটা কথা। কোনও স্যুইসাইডাল নোট পাওয়া যায় নি?

—পরে লালবাজারে যোগাযোগ করবেন। যা জানাবার ওরাই জানাবে।

জিপ এবং অ্যাম্বুল্যান্স চলে গেল। গেট বন্ধ। একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলাম। কর্নেলের বাড়ির দিকে যখন ফিরে চলেছি, তখন মাথার ভেতরটা খালি লাগছে। কাল রাতের দৃশ্যগুলো ভেসে এসে আবার দূরে সরে যাচ্ছে। কাল রাতে ইন্দ্রজিৎ কেন যেন ভয় পেয়েছেন মনে হয়েছিল। কিন্তু স্যুইসাইড করে বসলেন কেন? রাত্রেই কি কিছু ঘটেছিল? তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, গাড়িতে বসে থেকেই মধুকে ডাকছিলেন এবং মধু বেরুনোমাত্র গাড়ি থেকে বেরিয়ে সটান ঢুকে গেলেন বাড়ির ভেতরে। বিদায় সম্ভাষণ করার স্বাভাবিক ভদ্রতাটুকুও দেখালেন না!

এতক্ষণে মনে হচ্ছে, কেউ বা কারা কি ওঁকে অনুসরণ করছিল মহাজাতি সদন থেকে? কিন্তু তারপর স্যুইসাইডের ঘটনা কেমন যেন খাপছাড়া।

কর্নেলের ড্রয়িং রুমে ঢুকে ধপাস করে বসে পড়লাম। হরনাথ ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—বোম্বের ঠিকানা যোগাড় করতে

পারলেন ?

—গতরাতে ইন্দ্রজিৎ রায় স্যুইসাইড করেছে।

—স্যুইসাইড ? বলেন কী ? সর্বনাশ !

—হ্যাঁ পুলিশ এইমাত্র বডি নিয়ে গেল।

কর্নেল আস্তে বললেন—কী ভাবে স্যুইসাইড করেছে ?

—জানি না। বাথরুমে নাকি বডি পাওয়া গেছে। পুলিশ ডিটেলস কিছু বলতে চাইল না। আমি গিয়ে দেখি গলিতে ভিড়। অ্যাম্বুলেন্সে কাপড়ে ঢাকা বডি ঢোকানো হচ্ছে।

—তুমি বাড়িতে ঢুকেছিলে ? মধুকে মিট করেছ ?

—পুলিশ চলে গেলে গেট বন্ধ হয়ে গেল। কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে কথা বলোনি ?

—নাহ্। আমি ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছিলাম।

—আশ্চর্য ! ইন্দ্রজিতের জ্যাঠামশাইয়ের নাম জেনেছ ?

—নাহ্। বলছি তো ! আমি ভীষণ আপসেট।

কর্নেল হাসলেন।—সাংবাদিক হিসেবে তুমি একেবারে অযোগ্য। তুমি ঘটনাস্থলে গেলে। কিন্তু কার বাড়ি, এটুকুও জেনে এলে না। পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কথা বললে না। 'আপসেট' হয়ে ফিরে এলে ! আশ্চর্য !

বিরক্ত হয়ে বললাম—পাড়ার ছেলেরা বলল কি এক আউটসাইডার। তারা চেনে না।

হরনাথ ইতিমধ্যে শেখসায়েবকে ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছেন। শেখসায়েব মাতৃভাষায় বিড়বিড় করে কী সব বলছেন। চোখে-মুখে আগুন জ্বলছে। দুটো শব্দ কানে আসছিল—লুলু ! লুলু !

হরনাথ কর্নেলকে বললেন—শেখসায়েব বলছেন ওঁর 'লুলু' অর্থাৎ মুক্তোগুলো নিশ্চয় ওই বাড়িতে পাওয়া যাবে। কর্নেল ! প্লিজ আপনি পুলিশকে এবার বলে দিন ঘটনাটা। শেখসায়েবকে নিয়ে আমি তাহলে এণ্টালি থানায় গিয়ে কেস ডায়রি লেখানোর ব্যবস্থা করি। কারণ এখন আসামির খোঁজ পাওয়া গেছে, যদিও সে ডেড। তার চেয়ে বড় কথা, শেখসায়েবকে দিয়ে বডি শনাক্ত করানোও

দরকার।

কর্নেল চোখ বুজে দাড়ি টানছিলেন। বললেন—তার আগে আপনার বন্ধু শেখসায়েবের মতামত জেনে নিন মিঃ চন্দ্র! ওঁর কথায় আঁচ করেছি, উনি পুলিশকে এড়িয়ে চুরি যাওয়া মুক্তো উদ্ধার করতে এসেছেন।

—তা ঠিক। কারণ কেসটা গভর্নমেন্টের হাতে পড়লে মাল ফেরত পেতে অনেক ঝুটঝামেলা হবে। ফাইল চালাচালি আর ডিপ্লোমেটিক লেবেলে যোগাযোগ এ সব মস্ত ব্যাপার তা তো জানেন! এতে অনেক বেশি সময় লেগে যাবে। এদিকে ওঁর ভিসা মাত্র দিন সাতেকের। বাহারিনে ওঁর ব্যবসারও ক্ষতি হবে। গালফ ওয়রের ক্রাইসিস এখনও তো মেটেনি। এ সব কারণেই উনি পুলিশকে এড়িয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলে গেছে।

—হুঁ! তবু ওঁর মত জেনে নিন।

হরনাথ ইংরেজিতে শেখসায়েবকে কথাটা বললেন। অমনি শেখ-সায়েব দু'হাত নেড়ে বলে উঠলেন—না! না! নো! নো! আই ডোণ্ট লাইক দা পোলিস্‌। এভরিহোয়্যার ইন 'দা ওয়র্ল্ড' দে ক্রিয়েট ট্রাবল। না! না! আই লাইক দা প্রাইভেট আই!'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন—উনি 'প্রাইভেট আই' অর্থাৎ বেসরকারি গোয়েন্দার সাহায্য চান। তবে দুঃখের কথা, আমি তো পেশাদার প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই—সে আপনি ভালই জানেন। বরং ডিটেকটিভ কথাটা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি। কারণ 'টিকটিকি' তারই বাংলা সংস্করণ। তবে হ্যাঁ, রহস্যের প্রতি আমার আকর্ষণ আছে।

—এই কেসে রহস্য আছে কর্নেল!

—আছে। কারণ আপনার বন্ধু পুলিশের কাছে যেতে চান না।

হরনাথ হতাশ মুখে বললেন—কিন্তু ওঁকে সাহায্য না করলে আমার কারবারের ক্ষতি হবে।

—বরং আপনাকে একজন বিচক্ষণ প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি। রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার কে কে হালদার। গণেশ অ্যাভিনিউতে ওঁর ডিটেকটিভ এজেন্সি। এখনই

চলে যান। আমি ফোনে বলে দিচ্ছি। ওঁর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি। কর্নেল কিছুক্ষণ টেলিফোন ডায়াল করে বললেন—পাচ্ছি না। ঠিকানা দিচ্ছি। এখনই চলে যান।

ঠিকানা নিয়ে হরনাথ চন্দ্র এবং শেখ জুবাইর আল-সাবাহ্ হন্তদন্ত বেরিয়ে গেলেন। বললাম—হালদার-মশাইকে এই সাংঘাতিক কেস দিলেন? কেলেংকারি হয়ে যাবে কিন্তু। উনি যা হঠকারী মানুষ!

কর্নেল হঠাৎ গুরুগম্ভীর হয়ে বললেন—বসো। আরেক পেয়ালা কফি খেয়ে নার্ভ চাঙ্গা করো। তারপর আমরা বেরুব। ইন্দ্রজিৎ রায় ওরফে শংকর হাজরার স্যুইসাইড করার ব্যাপারটা আমার গোলমেলে মনে হচ্ছে।

দুই

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার যখন কোনও ঘটনাকে 'গোলমেলে' বলেন, তখন বুঝতে হবে উনি সেটার বাইরে দাঁড়িয়ে নেহাত দর্শকসুলভ কোনও মন্তব্য করছেন না। অর্থাৎ উনি গোলমালের জট ছাড়াতে নাক গলাবেনই।

অথচ উনি বাহারিনের শেখ সায়েব এবং জুয়েলার হরনাথ চন্দ্রকে কেন যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার ওরফে 'হালদার-মশাইয়ের' দিকে ছুটিয়ে দিলেন বুঝতে পারছিলাম না।

কফি খেয়ে চাঙ্গা হব কী, নেতিয়ে পড়ছিলাম যেন। গতরাতে যে লোকটিকে জলজ্যান্ত দেখেছি, যার কণ্ঠস্বর এখনও কানের পর্দায় সেঁটে আছে, আজ সকালে তার মড়া দেখার পর থেকে সেই লোকটা আমাকেও ভূতের মতো পেয়ে বসেছে। বিশ্বাস করতে বাধছে যা দেখেছি তা সত্যি, না কি আমারই কোথাও কোনও ভুল ঘটেছে? ঠিক সেই বাড়িটাই কি দেখে এলাম এবং পুলিশ অফিসারের মুখে 'ইন্দ্রজিৎ রায়' নামটাও কি সত্যি শুনে এলাম?

কর্নেল চাপা স্বরে কার সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন। ফোন রেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—চলো বেরুনো যাক।

যন্ত্রচালিতের মতো ওঁকে অনুসরণ করলাম। বৃদ্ধ রহস্যভেদী আমার হাবভাব আঁচ করেছিলেন। গাড়িতে ওঠার পর আমার দিকে ঘুরে বললেন—তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ, জয়ন্ত ?

হাসবার চেষ্টা করে বললাম—নাহ্! কেন ?

কর্নেল হাসলেন।—ডার্লিং! হাথিয়াগড় জঙ্গল থেকে আনা অর্কিডটার ফুল ফোটা দেখার জন্য আমার অন্তত এপ্রিল পর্যন্ত বেঁচে থাকা দরকার। কাজেই ভেবে দেখ, স্টিয়ারিংয়ে আমি বসব কি না।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললাম—এর চেয়ে অনেক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে দেখেছি আপনার পাল্লায় পড়ে। আমার নার্ভ অন্তত গাড়ি চালানোর মতো চাঙ্গা আছে।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানতে থাকলেন। লক্ষ্য করলাম, অভ্যাসমতো বাইনোকুলারটি সঙ্গে নিয়েছেন। টাক ঢাকতে টুপিও পরেছেন। চুরুটের ছাই সাদা দাড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে। শর্টকাটে অলিগলি হয়ে এগোচ্ছিলাম। একটা গলির মোড়ে গিয়ে কর্নেল দাড়ি ঝেড়ে আপনমনে বললেন—দশ লাখ ডলার দামের মুক্তো! ভারতীয় মুদ্রায় কয়েক কোটি টাকা। কাজেই এই রহস্যটাও খুব দামি।

বললাম—তাতে কী ? রহস্যভেদী হিসেবে আপনি তো তার চেয়ে দামি।

—আমাকে লড়িয়ে দেওয়ার দরকার নেই জয়ন্ত !

—আপনি যে অলরেডি লড়তে নেমে গেছেন, এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার আছে বস্।

—হুঁ। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, আমি একটা চেনা বাড়িতে অনেক বছর পরে যাচ্ছি। কর্নেল দাড়িতে আঁচড় কাটতে কাটতে আনমনে ফের বললেন—বিশাল গেট। ভেতরে ফুলবাগান। একটা সুইমিং পুল ছিল। একটা পোষা হরিণ···একটা কাকাতুয়া ···কালো টেরিয়ার কুকুর। আচ্ছা জয়ন্ত, গলিটার নাম কি কালীকিঙ্কর রায়চৌধুরী লেন।

—জানি না। লক্ষ্য করিনি। কাকেও জিজ্ঞেসও করিনি।

কর্নেল আপনমনে বিড়বিড় করতে থাকলেন—মধু! পুরাতন ভৃত্য বলতে যা বোঝায়। আসলে সমস্যা হল, বনেদি বাড়িতে পুরাতন ভৃত্য অনেকই থাকে। অবস্থা পড়ে এলে তারা বাতিল হয়ে যায়। শুধু একজন—হুঁ, সর্বত্র দেখেছি, তাদের একজনকে ছাড়ানো যায় না বা ছাড়া যায় না। সে থেকে যায়। পরমেশ রায়চৌধুরি আর অমরেশ রায়চৌধুরি। এক ভাই অন্য ভাইয়ের একেবারে উল্টো। পরমেশ আমার মতো চিরকুমার। অমরেশ ভোগী উচ্ছৃঙ্খল দুর্দান্ত। মাতাল অবস্থায় গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট বাধিয়ে মারা যান। ওঁর স্ত্রীর নাম ভুলে গেছি। প্রায় পনের বছর আগের কথা। ওঁদের একটি সন্তান ছিল—পরমেশ বলেছিলেন। তাকে নিয়ে অমরেশের বিধবা স্ত্রী কেন যেন বাড়ি থেকে রাতারাতি চলে যান। পরমেশ একা থাকতেন। নিঃসঙ্গ দুঃখী মানুষ। আমার মতো প্রকৃতি-ট্রকৃতি নিয়েই কাটাতেন। আমাদের নেচার-লাভার্স ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। সেই সূত্রে একদিন ওঁর বাড়িতে ডিনার খেতে গিয়েছিলাম।

কর্নেলের কথাগুলো কানকরে শুনছিলাম। সি আই টি রোডে পৌঁছে গেছি। বললাম—সামনে ডান দিকের গলি।

অমনি কর্নেল বলে উঠলেন—ইনটুইশন ডার্লিং, ইনটুইশন! অলৌকিকে আমার বিশ্বাস নেই। আর আকস্মিক যোগাযোগ বলতে যা বোঝায়, তার পেছনেও কার্যকারণ সম্পর্ক থাকে। যাই হোক, আমি সত্যিই পরমেশ রায়চৌধুরির বাড়িতে যাচ্ছি।

কর্নেলের কোনও কথায় আর বিশেষ অবাক হই না। কলকাতার প্রায় সব বনেদি অভিজাত পরিবারের সঙ্গে ওঁর কোনও-না কোনও ভাবে চেনাজানা থাকাটা স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছি।

এখনও গলিতে সামান্য জটলা আছে। গেটের কাছে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালাম। কর্নেল নেমে গিয়ে হাঁক দিলেন—মধু! মধু! রাতে দেখা সেই মধ্যবয়সী গুঁফো লোকটি কাছাকাছি কোথাও ছিল। গরাদ দেওয়া গেটের ভেতর তাকে পাষাণমূর্তির মতো দেখাল। কর্নেল বললেন—আমাকে চিনতে পারছ কি মধু? ঠিক আছে। না পারলে তোমার কর্তাবাবুকে গিয়ে বলো কর্নেলসায়েব

এসেছেন। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

এবার পাষাণমূর্তিতে প্রাণ এল। সে সেলাম ঠুকে আস্তে বলল—আপনি কর্নেলসায়েব? কর্তামশাই একটু আগে ফোন করে লাইন পেলেন না। আমাকে ঠিকানা দিয়ে একটা চিঠি পাঠাবেন বলছিলেন।

কর্নেল বললেন—গেট খুলে দাও। গাড়ি বাইরে রাখা ঠিক হবে না।

গেটের ভেতর এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে পোর্টিকোর তলায় গাড়ি দাঁড় করলাম। কর্নেল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন—মধুকে আমার মনে পড়েছে ভেবো না। মধুরও আমাকে মনে পড়ার কথা নয়। কিন্তু চান্স নিতে আমি ছাড়ি না।

মধু গেটে তালা আটকে ফিরে এল। বলল—পুলিশ বাইরের লোক ঢোকাতে বারণ করেছে। কর্তামশাইও ভিড় পছন্দ করেন না। আপনারা আসুন স্যার।

দরজা ঠেলে খুলে সে আমাদের একটা হলঘরে ঢোকাল। কর্নেলের সঙ্গ গুণে এবং পেশার কারণে এ ধরনের হলঘর ব্রিটিশ আমলের বনেদি বড়লোকের বাড়িতে দেখেছি। আজকাল এই সব বাড়ি প্রমোটাররা কিনে নিয়ে বহুতল বাড়ি বানাচ্ছে। হলঘরগুলোর চেহারা চরিত্র একই রকম। রঙচটা কার্পেট, নকশাদার মার্বেলের মেঝে। এক কোণ থেকে উঠে যাওয়া বাঁকাচোরা সিঁড়ি। সিঁড়ির শুরুতে সিংহের মুখ। দেয়ালে বড় বড় পেণ্টিং। জীবজন্তুর স্টাফ করা মুন্ডু। পাথরের ভাস্কর্য। আরও যা যা সব থাকা উচিত, এই হলঘরেও আছে।

কর্নেল যেতে যেতে বললেন—ইন্দ্রজিৎ তোমার কর্তামশাইয়ের ভাইয়ের ছেলে?

মধু ঘুরে অবাক চোখে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি শুনেছেন কী সাংঘাতিক কান্ড হয়েছে?

—শুনেছি। তো সে কবে এসেছিল?

—তা দিন দশ-বারো হবে।

—এর আগে সে মাঝে মাঝে আসত?

সিঁড়িতে উঠে মধু বলল—আসত। তবে খুব কম। কখনও বছরে একবার। কখনও দুবছর-তিনবছর পরে হঠাৎ এসে কর্তামশাইকে জ্বালাতন করত। ছোটবাবু যেমন ছিলেন, ওনার ছেলেও তেমন।

—ইন্দ্রজিৎ কোথায় থাকত জানো?

—কে জানে! কখনও বলত দিল্লি। কখনও বলত বোম্বাই। এবার এসে বলছিল আরব মুল্লুকে ছিল। ওর কথা বিশ্বাস করা কঠিন। তবে গত মাসে কর্তামশাই বলেছিলেন, কাগজে খোকাবাবুর ছবি ছেপেছে।

—তুমি দেখেছিলে?

—না স্যার! আমি মুখ্যু লোক। কাগজ পড়তে পারি না।

—ওপরে চওড়া করিডোরে পৌঁছে সে বলল—একটু দাঁড়ান স্যার। কর্তামশাইকে খবর দিই।

সে চলে গেল। কর্নেল কী বলতে যাচ্ছেন, সেইসময় বাঁদিকের একটা ঘরের দরজা খুলে এক যুবতী বেরুল। মহিলাদের বয়স সম্পর্কে আমার কোনও ধারণা নেই। তবে যে বেরুল, তাকে যুবতীই বলব। এ সব পরিবারে ফর্সা লাবণ্যময়ীদেরই আশা করা চলে। এই যুবতী কিন্তু তত ফর্সা নয়। মেয়েদের লাবণ্য সম্পর্কে আমার ধারণার সঙ্গে আমার বৃদ্ধ বন্ধুর ধারণার মিল কখনও দেখিনি। আমি নাকি যৌবনের চোখে দেখি বলে সব যুবতীকেই লাবণ্যময়ী দেখি। এ ক্ষেত্রে আমার শ্যেনদৃষ্টি প্রথমেই পড়েছিল মুখে এবং পরমুহূর্তে সিঁথিতে। সিঁদুরহীন সিঁথি দেখে ইন্দ্রজিতের সদ্যবিধবা স্ত্রী ধরে নিতাম—তাছাড়া মুখে ওই বিষাদের গাঢ় ছাপ। কিন্তু তক্ষুণি মনে পড়ে গেল ইন্দ্রজিৎ সস্ত্রীক এলে মধু তা অবশ্যই বলত।

সে আমাদের দিকে কেমন বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। পরনে আকাশী নীল শাড়ি এবং একই রঙের হাতাকাটা ব্লাউস। অগোছাল চুল। আমি মেয়েদের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারি না। কিন্তু আমার বৃদ্ধ বন্ধু এ ব্যাপারে ভীষণ স্মার্ট। লক্ষ্য করলাম, উনি তীব্র দৃষ্টিবাণে বিদ্ধ করেছেন তাকে। অথচ সে একই দৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

ততক্ষণে মধু এসে গেল।—আপনারা আসুন স্যার! বলে সে যুবতীর দিকে ঘুরল।—দিদিমণি! কর্তামশাই এই সায়েবদের জন্যে কফি করতে বললেন। আমাকে নীচে গিয়ে থাকতে হবে। আবার পুলিশ আসবে।

করিডর দিয়ে এগিয়ে একটা ঘরের পর্দা তুলল মধু। ঘরের সামনে বিশাল বারান্দা নীচে ফুলবাগান জঙ্গল হয়ে আছে। একটা এঁদো চৌকো ডোবা চোখে পড়ল। ওটাই হয়তো সুইমিং পুল ছিল। উঁচু পাঁচিলে ঘেরা বাড়িটার আয়তন বাইরে থেকে কল্পনা করা যায় না। দেশি-বিদেশি গাছপালাও অনেক।

ঘরটা একাধারে স্টাডি আর বেডরুম। আলমারিতে ঠাসা বই দেখে হঠাৎ মনে হয় লাইব্রেরিতে ঢুকেছি। দক্ষিণপূর্ব কোণে প্রকাণ্ড পালঙ্ক। দেয়ালে সাজানো অজস্র পেণ্টিং। ঘরে ঢুকে আবছা আঁধারে দৃষ্টি ঘষে গিয়েছিল। চাপা গম্ভীর গলায় এবার কেউ বলে উঠল—আসুন কর্নেল সায়েব।

এতক্ষণে দেখতে পেলাম, পালঙ্কের কাছ ঘেঁষে একটা টেবিলের পাশে ইজিচেয়ারে কর্নেলের বয়সী এক ভদ্রলোক বসে আছেন। ছিপছিপে গড়ন। পাতা চাপা ঘাসের মতো রঙ। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়িগোঁফ। পরনে পাঞ্জাবি পাজামা। একটা ছড়ি ইজি-চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে বাঁকা হয়ে পড়ে আছে। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে বললেন—আমার হিসেবে পনের বছর। তাই না?

পরমেশ রায়চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন না। হাত বাড়িয়ে কর্নেলের হাত নিলেন। হাতটা ছাড়লেন না। গলার ভেতর বললেন—আপনার কাছে লোক পাঠাচ্ছিলাম।

—মধু বলল। তবে তার আগেই আমি খবর পেয়েছিলাম, আপনার বাড়িতে একটা মিসহ্যাপ হয়েছে।

—আপনি বসুন। আমার ডান পা আর ডান হাতে পক্ষাঘাত। বাঁচার কোনও অর্থ হয় না। আপনি বসুন প্লিজ!

পরমেশের চোখে জল এসে গেল। কর্নেল পাশের চেয়ারে বসে বললেন—আলাপ করিয়ে দিই। দৈনিক সত্য সেবক পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী। জয়ন্তই বোম্বেতে গিয়ে ইন্দ্রজিতের

ইণ্টারভিউ নিয়েছিল !

পরমেশ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বসো বাবা ! তুমিই বলছি, কিছু মনে করো না।

বললাম—না, না। অবশ্যই তুমি বলবেন।

কর্নেল বললেন—আপনি কতদিন থেকে এভাবে অসুস্থ ?

পরমেশ বললেন—প্রায় এক বছর। বাথরুমে পড়ে গিয়েছিলাম। তারপর থেকে এই অবস্থা। নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে চেয়েছিল মধু। যাইনি। তো ওসব কথা থাক। আপনি কফির ভক্ত ছিলেন মনে আছে। কফি খেয়ে নিন। সব বলছি। আপনাকে বলা দরকার।

—একটি মেয়েকে দেখলাম। কোনও আত্মীয়া ?

পরমেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন—ধানবাদে আমার এক পিসতুতো ভাই ছিল। তার মেয়ে। বাবা-মা বেঁচে নেই। খবর পেয়ে আমি ওকে নিয়ে এসেছিলাম। তখন সবে স্কুল শেষ করেছে। কলকাতায় এনে কলেজে ভর্তি করে দিলাম। গতবছর এম এ-তে ভর্তি হওয়ার মুখে আমার হঠাৎ এই অবস্থা হল। বেঁকে বসল। আমাকে নাকি মধু দেখাশোনা করতে পারবে না। সারাক্ষণ আমার কাছে থাকে। দেখাশোনা করে। বলে পরমেশ ঘুরলেন দরজার দিকে।—আয় মিমি !

সেই যুবতী কফির ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল পরমেশ বললেন—তোকে তো কর্নেল সায়েবের কথা তখন বলছিলাম। আর এর নাম…

কর্নেল বলে দিলেন।—দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী। তোমার নাম মিমি। কিন্তু পুরো নাম যে চাই ! বলে কর্নেল একটু হাসলেন।—তোমার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে আমার সম্পর্কে কী শুনেছ জানি না। আমার এই এক বাতিক। যা জানি না, তা জানা চাই।

মিমি তেমনই বিহ্বল দৃষ্টে তাকিয়ে বলল—আমার নাম সুপর্ণা ব্যানার্জি।

কর্নেল কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন—বাঃ ! অসাধারণ ! বসো মিমি !

মিমি পালঙ্কের একটা বাজু ধরে দাঁড়িয়ে রইল। পরমেশ হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন—মিমি কাল রাতে অনেক সন্দেহজনক ব্যাপার দেখেছে। শুধু কাল রাতে নয়, ইন্দ্র আসার পর থেকেই লক্ষ্য করেছে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, ইন্দ্র স্যুইসাইড করেনি। তাকে কারা খুন করে বাথরুমে লটকে দিয়েছে। মিমি, সব খুলে বল কর্নেলসায়েবকে।

মিমি মুখ নামিয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল—কাল রাতে ইন্দ্রদা ওর ঘরে চুপিচুপি কার সঙ্গে কথা বলছিল। তখন হলঘরে বারোটা বাজছিল ঘড়িতে। আমার ঘুম আসছিল না। বারান্দায় বসে ছিলাম। মধুদা নীচে থাকে। আমি ভেবেছিলাম মধুদার সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু দরজায় কান পেতে শুনি অন্য কেউ কথা বলছে। তখন বুঝলাম, যে লোকটা দিনের বেলা ইন্দ্রদার সঙ্গে আসে, সে-ই এসেছে। আমি ভাবলাম সকালে জিজ্ঞেস করব ইন্দ্রদাকে কিন্তু সকালে চা দিতে গিয়ে দেখি, ইন্দ্রদার ঘর ভেজানো। তারপর দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। ভাবলাম বাথরুমে আছে। কিন্তু বাথরুম খোলা। উঁকি দিয়েই দেখি—

হঠাৎ মিমি দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল।...

মিমির কান্না দেখে পরমেশ বিরক্ত হয়ে বললেন—দ্যাখ্ মিমি, তোকে বারবার বলছি কান্নাকাটির কোনও মানে হয় না। ইন্দ্র মরেছে। আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। আমার স্পষ্ট কথা। কিন্তু আমার পয়েণ্টটা হল, আমরই বাড়িতে এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। ইন্দ্র যদি সত্যিই খুন হয়ে থাকে, অন্যখানে হলে আমি একটুও মাথা ঘামাতাম না। আমার কথা কর্নেল সাহেব আশা করি বুঝতে পারছেন।

কর্নেল বললেন—পারছি। আপনার ফ্যামিলির একটা সম্মান আছে। তাতে আঘাত পড়েছে।

—ঠিক। পরমেশ ক্ষুব্ধভাবে বললেন।—ইন্দ্র যে বাইরের উটকো লোক আবার আমার বাড়ির ভেতর ঢোকাচ্ছে, হারামজাদা মধুও সে-কথা আমাকে বলেনি। তা ছাড়া গতরাতে ইন্দ্রের ঘরের ওই ব্যাপারটা মিমি তখনই যদি আমাকে বলত!

মিমি বলল—আপনি স্লিপিং পিল খেয়ে ঘুমোন।
—তুই চুপিচুপি মধুকে গিয়ে ওঠাতে পারতিস!
মিমি মুখ নামিয়ে বলল—ইন্দ্রদা রেগে যাবে, হইচই করবে ভেবেছিলাম।
কর্নেল বললেন—অত রাতে বাইরের লোক এলে মধুর তা জানার কথা। মধু কী বলেছে?
পরমেশ বললেন—মধু রাতে গেটে তালা এঁটে রাখে। মধু বুঝতে পারছে না অত রাতে কেমন করে ইন্দ্রের ঘরে বাইরের লোক এল! মধু বলছে, খিড়কির দরজা দিয়ে ইন্দ্রই চুপিচুপি লোকটাকে বাড়ি ঢুকিয়ে থাকবে।
—খিড়কির দরজা কোনদিকে?
—মিমি, দেখিয়ে দে, কর্নেল সায়েবকে।
মিমির সঙ্গে কর্নেল এবং আমি বেরোলাম। চওড়া ব্যালকনিতে গিয়ে মিমি নীচে ঝোপঝাড় ও গাছপালার ভেতর একটা ছোট্ট দরজা দেখাল। কর্নেল বাইনোকুলারে দেখে নিয়ে বললেন—কর্পোরেশনের আবর্জনা জড়ো করার জায়গা। তার ওপাশে বস্তি। কাজেই বাইরের লোক চুপিচুপি আসার অসুবিধে নেই।
মিমি বলল—মধুদা ওই দরজা দিয়ে শর্টকাটে বাজারে যায়।
—একটা কথা মিমি। কাল অত রাতে তুমি জেগে ছিলে। এই বারান্দায় বসে ছিলে। কেন তা বলতে আপত্তি আছে?
মিমি আস্তে বলল—এবার ইন্দ্রদা আসার পর আমার কেন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল। ও যতবার এসেছে, জ্যাঠামশাইয়ের কাছে টাকা আদায় করেছে। ইন্দ্রদারও এই প্রপার্টিতে শেয়ার আছে। তাই টাকা আদায় করতে পারে। কিন্তু এবার আমার মনে হচ্ছিল, ও টাকা আদায় করতে আসেনি। বিশেষ করে ওই লোকটাকে যখনতখন সঙ্গে এনে চুপিচুপি কী সব কথাবার্তা বলছিল। আমার ভয় হয়েছিল, জ্যাঠামশাইকে—
মিমি হঠাৎ থেমে গেলে কর্নেল বললেন—বলো মিমি! তুমি কী ভেবেছিলে খুলে বলো।
—ইন্দ্রদা জ্যাঠামশাইকে মার্ডার করানোর জন্য হয়তো ভাড়াটে

খুনী এনেছে। মিমি আড়ষ্টভাবে কথাটা বলে কর্নেলের দিকে তাকাল।—লোকটার চেহারা দেখেই ভয় করে। আমার দিকে বিশ্রিভাবে তাকাত। ইন্দ্রদা চায়ের কথা বললে মধুদাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতাম।

—তুমি কোন ঘরে শোও?

—জ্যাঠামশাইয়ের ঘরেই।

—আসার সময় যে ঘর থেকে তুমি বেরিয়ে এলে, ওটাই কি ইন্দ্রজিতের ঘর?

মিমি মাথা দোলাল।—না। ইন্দ্রদা পাশের ঘরে ছিল। ওর ঘরের দরজা পুলিশ সিল করে দিয়েছে।

—হুঁ। তো যে ঘর থেকে তুমি বেরুলে—

মিমি দ্রুত বলল ওই ঘরে আমি থাকি। রাতে জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে শুতে আসি।

—তোমার ঘর থেকে ইন্দ্রজিতের ঘরে ঢোকার দরজা আছে?

—দরজাটা ইন্দ্রদার ঘরের ভেতর থেকে বন্ধ করা আছে। আমার ঘর থেকে খোলা যায় না।

—তুমি পুলিশকে কী বলেছ?

—জ্যাঠামশাই ওসব কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন। তাই কিছু বলিনি।

—মধু এ সব কথা জানে?

—জানে। মধুদাকেও জ্যাঠামশাই নিষেধ করেছিলেন।

—মধু গতরাতে সন্দেহজনক কিছু টের পায় নি?

—বলছে পায়নি। মধুদা ভীষণ ঘুমোয় আমি দেখেছি। রাতে হঠাৎ কোনও দরকার হলে ওকে ডেকে ওঠানো কঠিন।

কর্নেল বাইনোকুলারে নীচের বাগান খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন খিড়কির দরজাটা মধু খোলা দেখেছিল?

—হ্যাঁ। মধুদা বন্ধ করে দিয়েছে। জ্যাঠামশাইকে কথাটা খুলে বলতে ওকে নিষেধ করেছি আমি।

—ইন্দ্রজিতের বডি কী অবস্থায় ছিল?

মিমি শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল—বাথরুমের শাওয়ারের পাইপ

থেকে ঝুলছিল। গলায় মাফলারের ফাঁস ছিল।
—ইন্দ্রের ঘরের জিনিসপত্র লক্ষ্য করেছিলে?
—না। তখন কিছু লক্ষ্য করার মতো মনের অবস্থা ছিল না। আমি ইন্দ্রদাকে ওই অবস্থায় দেখার পর আর ও ঘরে ঢুকিনি।
পরমেশের ঘরে মধুর সাড়া পাওয়া গেল। তারপর সে বারান্দায় এসে বলল—নীচে পুলিশ এসেছে স্যার! কর্তামশাই আপনাকে ডাকছেন।
আমরা ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। পরমেশ বললেন—কর্নেলসায়েব! প্লিজ আপনি যা করার করুন। পুলিশের হাঙ্গামা আমি বরদাস্ত করতে পারব না। হারামজাদা বাউণ্ডুলে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা মেরে গেছে। মধু! মিমি! পুলিশকে কী বলতে হবে কর্নেল সাহেবের কাছে জেনে নে তোরা। উনি যা বলবেন, তা-ই বলবি। সাবধান করে দিচ্ছি। এ হাঙ্গামায় যেন আমরা জড়িয়ে না পড়ি।
কর্নেল বললেন—চলো মধু। মিমি, তুমি জ্যাঠামশাইয়ের কাছে থাকো।
পরমেশ সাবধান করিয়ে দিলেন।—ওদের বলে দিন কর্নেল সায়েব, পুলিশকে কী বলবে।
—আগে যা বলেছে, তার বেশি কিছু বলবে না।
মধু নীচের হল ঘরে পুলিশ অফিসারদের বসিয়ে রেখে এসেছিল। পুলিশ যে এ ফ্যামিলির আভিজাত্য সম্পর্কে সচেতন, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। তা না হলে সোজা ওপরে উঠে আসতেন ওঁরা।
কিন্তু হলঘরে ঢুকেই চমকে উঠলাম। স্বয়ং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি কমিশনার অরিজিৎ লাহিড়ি এসে হাজির। জোরালো হেসে বললেন—জয়ন্তবাবুকে যে দেখতে পাব, জানতাম। অবশ্য ফোনে কর্নেল বলেননি।
কর্নেল বললেন—তোমাকে ফোন করার সময় জয়ন্ত আমার ঘরেই বসে ছিল। কিন্তু ও তখন এমন শক্‌ড্‌ যে ফোনে আমি কার সঙ্গে কথা বলছি ওর কানে ঢোকেনি।
অরিজিৎ বললেন—শক্‌ড্‌?
—হুঁউ। কারণ আছে। পরে বলব'খন। তবে আপাতত ইন্দ্রজিতের

ঘরটা দেখা দরকার।

—চলুন।

পুলিশের বড় কর্তার সঙ্গে আমার দেখা সেই অফিসারও ছিলেন। লক্ষ্য করলাম উনি বেজায় অবাক হয়ে গেছেন। নেহাত সুইসাইড কেস বলে ঝক্কি থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলেন নিশ্চয়। নিছক রুটিনমাফিক ঘর সিল করে একটা মামুলি তদন্ত সারার তালে ছিলেন বোঝা যায়। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুলে হয়তো একটু নড়ে বসতেন। তবে আজকাল যা হচ্ছে, তা-ই হত। পরমেশ ভাইপোর জন্য মাথা ঘামাতে রাজি নন। কাজেই কেস ঝুলে থাকতে থাকতে ফাইলের তলায় চাপা পড়ে যেত।

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে অফিসারটি আমাকে চুপিসাড়ে জিজ্ঞেস করলেন—দাড়িওলা বুড়ো ভদ্রলোক কি এ বাড়ির কোনও আত্মীয়?

বললাম—নাহ্।

—কে উনি?

—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—ওরে বাবা!

অফিসারের মুখের দিকে তাকালাম। মুখে নার্ভাস হাসি। বললাম—চেনেন না কি?

—নাম শুনেছি। বলে অফিসার গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর হন্তদন্ত সিঁড়ি ভেঙে ডি সি ডি ডি লাহিড়ি সায়েবের সঙ্গ ধরলেন। দুজন কনস্টেবল উঠছিল। তাদের ঠেলে ওপরে উঠে গেলেন।

পুরনো আমলের সব বাড়ির ছাদ বেজায় উঁচু। প্রথমে সেটা লক্ষ্য করিনি। এখন দেখলাম, আজকালকার হিসেবে দোতলাটা প্রায় তিনতলার সমান উঁচু। নাকি এতক্ষণে অকুস্থলে ঢুকতে যাচ্ছি বলে উত্তেজনায় আমার সিঁড়ি ভাঙতে কষ্ট হচ্ছিল?

দরজার সিল দেখে নিয়ে অফিসারটি সিল ছাড়িয়ে তালা খুললেন। একটা আশ্চর্য সুগন্ধ ভেসে এল। মনে পড়ে গেল গত রাতে ইন্দ্রজিতের পোশাক থেকে এই বিদেশি সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। লোকটা মুক্তোচোর হলেও শৌখিন ছিল। দামি বিদেশি সিগারেট খেত।

কনস্টেবলরা জানলাগুলো খুলে দিল। লক্ষ্য করলাম কর্নেল ঘরের

ভেতরটা দেখছেন। একটা পুরনো নিচু খাটে সুন্দর বিছানা পাতা আছে। একটা টেবিল আর দুটো গদি আঁটা চেয়ার ছাড়া আসবাব নেই। দেয়ালে আঁটা ব্র্যাকেটে শার্ট-প্যান্ট ঝুলছে। টেবিলের ওপর জলের একটা গ্লাস আর জলভর্তি কাচের জগ। তলায় একটা ব্রিফকেস দেয়াল ঘেঁষে রাখা আছে। কর্নেল সেটা তুলে টেবিলে রাখলেন।

অরিজিৎ বাথরুমে উঁকি দিয়ে বললেন—একটা ভাঙা গ্লাস পড়ে আছে দেখছি!

অফিসারটি বললেন—দেখেছি স্যার! মদ ছিল ওতে। মদ খেতে খেতে ঝোঁকের মাথায়—মানে স্যার, ইট অ্যাপিয়ার্স সো।

—গ্লাসে মদ ছিল কি না আপনি সিওর?

—না স্যার! গন্ধ টের পেয়ে মদ মনে হয়েছে।

—গ্লাসের তলায় এখনও একটু আছে দেখছি। ওটা ফরেন্সিক টেস্টের জন্য পাঠানো উচিত ছিল।

—এখনই পাঠাচ্ছি স্যার!

—রুমাল-টুমাল দিয়ে ধরুন গ্লাসটা। আঙুলের ছাপ টেস্ট করতে হবে।

অরিজিৎ বাথরুমে ঢুকে গেলেন। কর্নেল ব্রিফকেস খুলে ফেলেছেন ততক্ষণে। বললাম—চাবি দেওয়া ছিল না দেখছি।

—না থাকাই স্বাভাবিক। কর্নেল একটা ফাইল বের করে খুললেন। দেখে বললেন—নিউজপেপার কাটিংস! হুঁ, আজকের মর্নিং ফ্লাইটে এয়ার টিকেট আছে।

বলে ব্রিফকেসের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। অরিজিৎ ডাকছিলেন—আসুন কর্নেল! ওসব পরে হচ্ছে।

কর্নেল ব্রিফকেস বন্ধ করে বাথরুমে গেলেন। আমিও গেলাম, যদিও কেমন একটা তীব্র অস্বস্তি বোধ করছিলাম। মনে হচ্ছিল, শাওয়ার পাইপ থেকে ঝুলন্ত ইন্দ্রজিৎ রায়কে অবিকল দেখতে পাচ্ছি।

অরিজিৎ কোমোডের দিকে আঙুল তুলে বললেন—এক টুকরো তুলো কোমোডের ভেতর পড়ে আছে।

কর্নেল দেখে নিয়ে বললেন—হুঁ। তুলোই বটে। তবে তলার জলটা দেখে মনে হচ্ছে স্বাভাবিক জল নয়।

অরিজিৎ গম্ভীর মুখে বললেন—ক্লোরোফর্ম। সিওর!

চমকে উঠলাম। তা হলে ক্লোরোফর্মে ভেজানো তুলো নাকে চেপে ধরে ইন্দ্রজিৎবাবুকে—

কর্নেল থামিয়ে দিলেন আমাকে।—জয়ন্ত! অবভাসতত্ত্বের কথা ভুলে যেও না। যা যেমনটি দেখাচ্ছে, তা তেমনটি নয়। যাই হোক, অরিজিৎ! এখানে আর কিছু দেখার নেই। তুলোটা মেথর ডেকে তুলে ফরেনসিকে পাঠানো হোক। তোমাদের অফিসারকে বলে দাও, আর কী কী করতে চাও। ব্রিফকেসটাও থানায় নিয়ে যেতে বলো। তারপর এস তোমার সঙ্গে পরমেশবাবুর আলাপ করিয়ে দিই।

একটু পরে আমরা পরমেশবাবুর ঘরে গেলাম। কর্নেল তাঁর এবং মিমির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। মিমি আগের মতো পালঙ্কের বাজু আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল।

পরমেশ শ্বাস ছেড়ে বললেন—কী বুঝলেন আপনারা?

অরিজিৎ বললেন—সুইসাইড নয়, হোমিসাইড। স্রেফ খুন।

—হুঁ! ইন্দ্র বেঘোরে একদিন মারা পড়বে আমি জানতাম। কিন্তু আমারই বাড়িতে এসে মারা পড়ল! এখানেই আমার ফ্যামিলির প্রেসটিজে ঘা লেগেছে। কার এত সাহস হল? আমি পঙ্গু। কিন্তু পঙ্গু হলেও আমি বাঘ। কর্নেলসায়েব আমাকে জানেন। আমি চাই খুনী ধরা পড়ুক। সে জন্য আমি প্রপার্টি বেচতেও রাজি।

কর্নেল বললেন আপনি উত্তেজিত হবেন না। শুধু একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

—বলুন!

—জুয়েলার হরনাথ চন্দ্রকে আপনি চেনেন?

—হরনাথ? পরমেশ আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলেন।—এই তো গত মাসে এসেছিল।

—কেন?

পরমেশ তেতো মুখ করে বললেন—ইন্দ্র কলকাতা এসেছে কি না জানতে এসেছিল। ইন্দ্রের সঙ্গে ওর চেনা আছে শুনে আমার অবশ্য অবাক লাগেনি। ইন্দ্র একসময় ওদের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ছিল। গালফে চন্দ্রদের কারবার আছে বলত।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ঠিক আছে। আমরা চলি পরমেশ-বাবু। আজ এ পর্যন্তই।...

তিন

আমার বোধবুদ্ধি ঘুলিয়ে গিয়েছিল। জুয়েলার হরনাথ চন্দ্রের আচরণ তো ভারি অদ্ভুত! ইন্দ্রজিৎ একসময় ওঁর অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ছিল এবং গত মাসে উনি পরমেশের কাছে খোঁজ নিতে এসেছিলেন ইন্দ্রজিৎ কলকাতা ফিরেছে কি না। অথচ এ সব কথা বেমালুম চেপে গেলেন কর্নেলের কাছে?

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় ইন্দ্রজিতের ছবি দেখে তাকে শংকর হাজরা বলে শনাক্ত করা একটা অদ্ভুত মিথ্যা। আরও রহস্যময় শেখ জুবাইর আল সাবাকে হরনাথের সত্যগোপন।

এদিকে ইন্দ্রজিতও আমাকে মিথ্যা বলেছিল। তার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলেমেয়ে আছে এবং তারা নাকি বাইরে থাকে! অথচ তার জ্যাঠামশাই চিরকুমার।

ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ি কর্নেলের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন নিজের দফতরে। কর্নেলের সঙ্গে তাঁর অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে উত্তেজিতভাবে বললাম—এখনই চন্দ্রকে পাকড়াও করা দরকার। শেখ সাহেবকেও ওঁর মুখোস ফাঁস করে দিন।

কর্নেল চোখ বুজে চুরুট টানছিলেন। শুধু বললেন—হুঁ।

—হুঁ কী বলছেন? লোকটার কী স্পর্ধা, আপনার সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে এসেছিল!

-হুঁ!

ক্ষপা হয়ে বললাম—কী খালি হুঁ হুঁ করছেন? হরনাথ চন্দ্র শেখসায়েবের সঙ্গে প্রতারণা করছে বুঝতে পারছেন না?

কর্নেল হাসলেন। তা পারছি ডার্লিং। তবে হরনাথ চন্দ্র আমার সুপরিচিত। সেটাই যত সমস্যা।

—হরনাথই ইন্দ্রজিৎকে লোক দিয়ে খুন করিয়েছে। ইন্দ্রজিতের ঘর থেকে মুক্তোগুলো হাতিয়েছে।

—লে লুল্লু!

অবাক হয়ে বললাম—তার মানে?

—তুমি ত্রৈলোক্যনাথের উপন্যাস পড়নি জয়ন্ত? এক আমীর সন্ধ্যাবেলা তাঁর বউয়ের উদ্দেশে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, 'লে লুল্লু'! অমনি লুল্লু নামে একটা ভূত আমীরের বউ নিয়ে ভেগে গিয়েছিল। আমাদের এই শেখসায়েবও একজন আমীর লোক। তাঁর মুখে 'লুল্লু' না হলেও 'লুলু' শুনেছি। লুলু মানে অবশ্য মুক্তো। এক্ষেত্রেও যেন একটা ভূতুড়ে রহস্যের আঁচ পাচ্ছি।

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হাসলেন। ষষ্ঠীচরণ যথারীতি পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়াল। কর্নেল তার দিকে হঠাৎ চোখ কটমটিয়ে বললেন—জয়ন্তের এ বেলা লাঞ্চের নেমন্তন্ন।

—আজ্ঞে বাবামশাই! সব রেডি! বলে ষষ্ঠীচরণ অদৃশ্য হল।

বললাম—হরনাথ চন্দ্রকে মুখোমুখি জোচ্চোর না বলা পর্যন্ত আপনার লাঞ্চ আমার হজম হবে না বস্।

কর্নেল আস্তে বললেন—অরিজিৎকে বলেছি হরনাথবাবুকে খুঁজে বের করতে।

—খুঁজে বের করার কী আছে? তার দোকান আছে। বাড়ি আছে। শেখসায়েবের হোটেলের ঠিকানাও নিশ্চয় আপনার কাছে আছে। তা ছাড়া আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদার মশাইয়ের কাছে ওঁদের পাঠিয়েছেন। হালদারমশাইকে আবার টেলিফোনে—

আমার কথা থেমে গেল ডোরবেলের টুং টাং বাজনায়। কর্নেল হাঁকলেন—ষষ্ঠী!

ষষ্ঠী যাকে নিয়ে এল, সে সুপর্ণা ওরফে মিমির মতোই আরেক বিষাদপ্রতিমা। কিন্তু মিমির চেয়ে স্মার্ট, ফর্সা এবং রূপসী বোঝা যাচ্ছিল, সাজগোজ করে প্রসাধিত লাবণ্য নিয়েই সে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। হঠাৎ কোনও আকস্মিক ঘটনায় বিচলিত হয়ে

এই বৃদ্ধ রহস্যভেদীর কাছে ছুটে এসেছে। এমন তো অনেকেই আসে। নিশ্চয় কোনও অন্য কেস নিয়ে এসেছে। কিন্তু সে আমাকে অবাক করে ভাঙা গলায় বলে উঠল—মিমি আপনার ঠিকানা দিল কর্নেল সরকার। আমি আপনার সাহায্য চাই।

কর্নেল বললেন—বসুন! তারপর আপনার নাম বলুন।

যুবতী সোফায় আলতোভাবে বসে রুমালে চোখ মুছে বলল—আমার নাম বনানী সেন। শ্যামপুকুর এরিয়ায় থাকি। মিমি আমার সঙ্গে সেণ্ট পলসে পড়ত। সেই থেকে ওঁর সঙ্গে চেনাজানা।

—বুঝেছি। আপনি কী ব্যাপারে আমার সাহায্য চান।

বনানী আস্তে বলল— আমাকে তুমি বলুন।

—বেশ। বলো।

—আমি ইন্দ্রের ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। বনানী কথাটা বলার পর একটু চুপ করে থাকল। তারপর শ্বাস ছেড়ে ফের বলল —আগাগোড়া ব্যাকগ্রাউণ্ডটা খুলে বলা দরকার। গতরাতে ইন্দ্র আমাকে মহাজাতিসদনে ম্যাজিক শো'তে নিয়ে গিয়েছিল। শো শেষ হওয়ার পর ভিড়ে ওকে হারিয়ে ফেললাম। অনেক খুঁজে রাগ করে বাড়ি ফিরে গেলাম। ভেবেছিলাম সকালে ইন্দ্র রিং করবে কিংবা আমাদের বাড়িতে চলে আসবে। দশটা সাড়ে দশটা অব্দি অপেক্ষা করে ওর কোনও সাড়া পেলাম না। তারপর মিমিকে রিং করলাম। ওর জ্যাঠামশাই বদরাগী লোক। সাড়া দিয়ে বললেন, ইন্দ্র মরেছে। অদ্ভুত মানুষ! মিমিকেও ডেকে দিলেন না। ফোন রেখে দিলেন।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, তারপর তুমি চলে এলে মিমিদের বাড়িতে?

বনানী রুমালে চোখ মুছে বলল—হ্যাঁ। এসেই শুনলাম।

—হ্যাঁ। ইন্দ্রের সঙ্গে তোমার এমোশনাল সম্পর্ক ছিল?

—এ মাসেই আমাদের ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশনের কথা ছিল। গাল্‌ফ থেকে ও চিঠি লিখেছিল। গাল্‌ফ ওয়র শুরু হওয়ার পরে। ও লিখেছিল, যেভাবেই হোক কলকাতা ফিরে যাবে।

—তুমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা পড়ো?

বনানী অবাক চোখে তাকাল কেন?

—পড়ো না?
—না। আমার বাবা রিটায়ার্ড মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। উনি ইংলিশ পেপার রাখেন বাড়িতে। আমি চোখ বুলোই। খুঁটিয়ে কিছু পড়ি না।
—তুমি কী করো?
—একটা ট্রেডিং এজেন্সিতে এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ডেটা রিসার্চ সেকশনে কাজ করি। কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়েছিলাম।
—ইন্দ্রজিতের সঙ্গে কীভাবে পরিচয় হয়েছিল?
—গত বছর মিমিদের বাড়িতে প্রথম আলাপ। তারপর···
বনানী দ্রুত বলল—ইন্দ্র আমাদের অফিসেও যেত। কলকাতা এলে তো যেতই, তা ছাড়া আমাদের কোম্পানির সঙ্গে ওর ট্রেড রিলেশন হয়ে গিয়েছিল। আমিই ওকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম। গাল্‌ফ এরিয়ায় কোম্পানির কারবার আছে।
কর্নেল আবার ঘড়ি দেখে বললেন তুমি আমার কাছে কী সাহায্য চাও?
—ইন্দ্র সুইসাইড করল কেন? এটা আমার কাছে অবাক লাগছে।
—মিমি বলল সুইসাইড করেছে?
—হ্যাঁ। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না। ইন্দ্রের আচরণে তেমন কোনও আভাস পাইনি।
—গত রাতে ইন্দ্র ওভাবে ভিড়ে হারিয়ে গেল বলছ। তারপর রাতেই তোমার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল ওর। কিন্তু নেয়নি। এই আচরণ অস্বাভাবিক নয়?
বনানী কর্নেলের দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরে বলল হ্যাঁ। আমার এটা ভাবা উচিত ছিল।
—ম্যাজিক শো দেখতে ইন্দ্র কি তোমাকে প্রোপোজ করেছিল?
—না। আমিই প্রোপোজ করেছিলাম।
—তুমি শংকর হাজরা নামে কাকেও চেনো?
বনানী চমকে উঠল।—শংকর হাজরা? বলে সে একটু ইতস্তত করল। মুখ নামিয়ে নখ খুঁটতে খুঁটতে বলল ফের—ইন্দ্র একদিন বলেছিল, বোম্বে থেকে গাল্‌ফে যেতে পাসপোর্ট পাচ্ছিল না।

তাই অন্যের নামের একটা পাসপোর্ট ম্যানেজ করেছিল। লোকটা তারই মতো দেখতে। শংকর হাজরা নামটা আমার মনে পড়ছে।

—ইন্দ্র গাল্‌ফে কোথায় থাকত ?

—বাহারিন স্টেটে। থাকত মানামা নামে একটা জায়গায়। স্টেট ক্যাপিট্যাল। ওখানে আমাদের কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ আছে।

—তোমাদের কোম্পানির কলকাতা অফিসের ঠিকানা কী ?

বনানী পার্স থেকে একটা কার্ড বের করে কর্নেলকে দিল। কর্নেল টেবিলে রেখে বললেন।

—তুমি জুয়েলার হরনাথ চন্দ্রকে চেনো ?

—না তো। কেন ?

—ইন্দ্রের কাছে কিছু শোনোনি ?

—না।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ইন্দ্র কেন সুইসাইড করল তা জানতে তোমার আগ্রহ কেন ?

বনানী শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে ভাঙা গলায় বলল—আমার বিশ্বাস, ইন্দ্র সুইসাইড করেনি। ওর জ্যাঠামশাই ওকে প্রপার্টির শেয়ার দিচ্ছিলেন না। ইন্দ্র আমাকে বলেছিল এসব কথা। ওর জ্যাঠা-মশাইই মধুকে বা কোনও গুণ্ডাকে দিয়ে ওকে মার্ডার করিয়েছেন। ভদ্রলোক খুব বদরাগী। তা ছাড়া ইন্দ্রের কাছে শুনেছি, ছেলেবেলায় ইন্দ্র আর ওর মাকে উনি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন আমার তাড়া আছে। তুমি এস। আমি দেখি কী করতে পারি।

বনানী উঠে দাঁড়িয়ে বলল কর্নেল সরকার! মিমির কাছে আপনার পরিচয় পেয়েছি। যদি কিছু মনে না করেন, এই মিষ্টি সলভ্ করার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য খরচ করতে রাজি আছি।

কর্নেল বললেন।—দরকার হবে না। আমি ডিটেকটিভ নই। কাজেই ফি নিই না। তবে তোমাকে বলা উচিত, এই কেসে আমি ইন্টারেস্টেড। দরকার মতো তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

বনানী বেরিয়ে যাওয়ার পর বললাম প্রেম এমন সাংঘাতিক হয়, প্রথম

দেখলাম। যেন প্রতিহিংসাপরায়ণ বাঘিনী! বাপ্‌স!

—লে লুল্লু!

হেসে ফেললাম। আবার ত্রৈলোক্যনাথের ভূতনাথের ভূতটাকে লেলিয়ে দিচ্ছেন কেন?

কর্নেল কার্ডটা তুলে আমাকে দিয়ে বললেন—লুলু এবং লুলুভূত এই কেসে একাকার হয়ে গেছে ডার্লিং।

কার্ডটা দেখে বললাম—আশ্চর্য তো! বনানী সেন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট। মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির এই ডেটা রিসার্চ সেকশনটা দেখছি পার্ল উইংয়ের।

—হুঁ। গাল্‌ফ এরিয়ায় প্রাকৃতিক মুক্তো প্রচুর মেলে। বছরে কত প্রোডাকশন হয়, বাজার দরের ওঠানামা, রফতানি ইত্যাদি ব্যাপারে এই এজেন্সি মনে হচ্ছে নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ করে। কর্নেল চুরুট ঘষটে নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে রাখলেন। ফের বললেন—মানুষের এই স্বভাব জয়ন্ত। তোমাকে বরাবর বলে আসছি, আমরা জানিনা যে আমরা কী জানি। বনানী জানে না যে সে কী জানে। যাই হোক, লাঞ্চ সেরে নিই। ষষ্ঠী! আমরা খাব।

ডাইনিং থেকে ষষ্ঠীচরণের সাড়া এল সব রেডি বাবামশাই।

ঠিক তখনই আবার ডোরবেল বাজল। কর্নেল বিরক্ত হয়ে হাঁকলেন ষষ্ঠী।

তারপর দেখলাম হন্তদন্ত শেখ জুবাইর আল সাবা ঘরে ঢুকে ধপাস করে সোফায় বসে মাতৃভাষায় কয়েকটা শব্দ সগর্জনে আওড়ালেন। কর্নেল ইংরেজিতে বললেন—কী ব্যাপার শেখ সাহেব?

শেখ সায়েব ইংরেজিতে বললেন—সাংঘাতিক ঘটনা! মিঃ চন্দ্রকে দুটো লোক জোর করে তাঁরই গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। আর আপনার ওই গোয়েন্দা লোকটি বদ্ধ পাগল। গাড়িটার পেছনে দৌড়ে বেপাত্তা হয়ে গেলেন!

—বলেন কী! কোথায়!

শেখসায়েব হাঁসফাঁস করে বললেন গোয়েন্দা লোকটিকে সব বলে আমরা রাস্তায় নেমেছি। উনিও বিদায় দিতে নেমেছেন। মিঃ চন্দ্র গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিংয়ে বসেছেন। আমি গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি।

হঠাৎ একটা ডাকু গাড়ির দরজা খুলে মিঃ চন্দ্রের গলায় ফায়ার আর্মসের নল ঠেকিয়ে সরে বসতে বলল। তারপর নিজে স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি স্টার্ট দিল। আরেকটা ডাকু পিছনের সিটে উঠে বসল। তারপর গাড়িটা জোরে বেরিয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ডের ঘটনা। আমি হতভম্ব। গোয়েন্দা লোকটি বোকার মতো পেছনে দৌড়ে গেলেন! রাস্তার লোকেরা কেউ কিছু বুঝতেই পারল না। আজব দেশ বটে! আমি চুপচাপ কেটে পড়লাম। একটা ট্যাক্সি পাওয়াও যায় না। গিশ! কারিব! কল্‌ব্‌।

—আপনি কি পায়ে হেঁটে এলেন তা হলে?

শেখসায়েব দু-হাত নেড়ে বললেন—লা লা! না, না ট্যাক্সি পেলাম। বেশি টাকা দিলাম। কিন্তু এখন কী ভয়ংকর ঘটনা দেখুন তা হলে! আমার দেশ হলে এতক্ষণ কতগুলো গর্দান পড়ে যেত!

কর্নেল টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। শেখসায়েবের ফোঁস ফোঁস শ্বাসের শব্দে ঘরে ঝড়ে বয়ে যাচ্ছিল। আরবের মরুঝড় সাইমুম বলা চলে।

শেখসায়েবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আশ্বস্ত করে কর্নেল হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন। উনি উঠেছেন চৌরঙ্গি এলাকার অভিজাত হোটেল কণ্টিনেণ্টালে। সুইট নম্বর এবং স্বদেশের ঠিকানালেখা কার্ড রেখে গিয়েছিলেন আরব মুক্তো-ব্যবসায়ী। হাবভাবে বোঝা যাচ্ছিল, হারানো মুক্তো উদ্ধারের চেয়ে এদেশে কয়েকটি গর্দান ফেলতে পারলেই যেন উনি খুশি।

লাঞ্চ খেতে বসে কর্নেলকে কয়েকটি প্রশ্ন ছুড়ে কোনও জবাব পেলাম না। অবশ্য কর্নেল বরাবর পরামর্শ দিয়ে থাকেন—খাওয়ার সময় কথা বলা মোটেও উচিত নয়। প্রথম কারণ, খাদ্যের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় কারণ, খাদ্য শ্বাসনালীতে আটকে যেতে পারে।

ড্রয়িংরুমে ফিরে উনি ইজিচেয়ারে বসলেন এবং চুরুট ধরিয়ে যথারীতি চোখ বুঝলেন। আমি সোফায় পা ছড়িয়ে আধশোওয়া ভঙ্গিতে সিগারেট ধরালাম।

বঙ্গীয় সনাতন আচার অনুসারে ভাতঘুমের প্রতি আমার আসক্তি

আছে। কেটে গেল টেলিফোনের বিরক্তিকর শব্দে। চোখ খুলে দেখলাম কর্নেল ফোন তুললেন।...বলছি।...হুঁ, তুমি ঠিকই ধরেছিলে।...বলো কী! হুইস্কিতে...দ্যাটস রাইট।...কী নাম বললে? কুঞ্জনাথ?...সৎভাই? ওঁর রিঅ্যাকশন কী?...হুঁ...হুঁ ...বুঝতে পারছি...অ্যাঁ? হাঃ হাঃ হাঃ! হালদারমশাই...ঠিক আছে। রাখছি।

টেলিফোন রেখে কর্নেল আমার দিকে ঘুরলেন। বললেন—অরিজিৎকে জোর লড়িয়ে দিয়েছি। পোস্ট মর্টেমের প্রাইমারি রিপোর্টে জানা গেছে, ইন্দ্রজিৎ যে হুইস্কি খাচ্ছিল, তাতে নার্কোটিক্‌স্‌ মেশানো ছিল। কিন্তু খুনী বেশি সময় নিতে চায়নি। তাই ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করে। তারপর মাফলারের ফাঁসে শ্বাস আটকে ওকে মেরে ঝুলিয়ে দেয়। শুধু একটা খটকা থেকে যাচ্ছে। একজনের পক্ষে ইন্দ্রজিতের বডি ওভাবে ঝোলানো সম্ভব হতে পারে না. যদি না খুনী কোনও দৈত্যদানব হয়। কাজেই কমপক্ষে তার একজন সহকারি ছিল।

বললাম—ফোনে কুঞ্জনাথ বলছিলেন। কে সে?

—জুয়েলার চন্দ্র ব্রাদার্সের দ্বিতীয় পার্টনার। হরনাথবাবুর ছোটভাই। কিন্তু সৎভাই। কর্নেল হাসলেন। নিভে যাওয়া চুরুট জ্বেলে ফের বললেন—হালদারমশাই কিডন্যাপারদের তাড়া করে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে গাড়ির বনেটের ওপর ওঠার চেষ্টা করেছিলেন। পড়ে গিয়ে সামান্য চোট খেয়েছেন। তারপর বউবাজারে চন্দ্র ব্রাদার্সের দোকানে ছুটে যান। সেখানে কুঞ্জনাথবাবুকে সব বলেন। তারপর দুজনে থানায় যান।

—তাহলে দেখা যাচ্ছে, শেখসায়েব আর হরনাথবাবুকে কারা ফলো করে এসেছিল। কিন্তু হরনাথবাবুকে কিডন্যাপ করল কেন?

—তুমিই একটু ভেবেচিন্তে বলো। এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতেও পারো।

আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে বললাম—হরনাথবাবু যে ভাড়াটে খুনী দিয়ে ইন্দ্রজিৎকে খুন করে মুক্তো হাতিয়েছেন, সে-ই হরনাথবাবুকে কিডন্যাপ করেছে মুক্তো-আদায়ের লোভে।

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন—হুঁ। এ-ও একটা পয়েণ্ট।

উৎসাহে চাঙ্গা হয়ে বললাম—কিন্তু কর্নেল, খুনীর একজন সহকারী থাকার কথা বললেন। সেই লোকটা মধু নয় তো?

কর্নেল একই সুরে বললেন—এ-ও একটা পয়েণ্ট।

—পুলিশকে বলুন মধুকে অ্যারেস্ট করে জেরা করুক।

—পুলিশ যা করবে, তা তাদের নিজের পদ্ধতি। আমি পুলিশকে হুকুম দেবার কে? তুমি বরং হোটেল কণ্টিনেণ্টালে শেখসায়েবকে রিং করো। উনি ফিরেই রিং করবেন বলেছেন। করছেন না কেন জানা দরকার।

কর্নেল শেখসায়েবের কার্ড দিলেন। ডায়াল করে সাড়া পেলাম। কোমল এবং প্রেমিকাসুলভ কণ্ঠস্বর। বললাম—প্লিজ পুট মি টু সুাইট নাম্বার টু জিরো ওয়ান।

—ইওর নেম প্লিজ!

—জয়ন্ত চৌধুরি ক্রস দা ডেইলি সত্যসেবক পত্রিকা।

—প্লিজ হোল্ড অন!

একটু পরেই শেখ সায়েবের গর্জন ভেসে এল কিশ্। কারিব্। কলব (নিশ্চয় কদর্য গালাগালি)!

—শেখ জুবাইর আল সাবা! আমি জয়ন্ত চৌধুরি বলছি। কর্নেল নীলাদ্রি সরকার আপনার জন্য উদ্বিগ্ন।

—কর্নেল সরকারকে বলুন আমি নিরাপদে পৌঁছেছি। এদেশের ডাকুরা আমার কাছে খরগোশের বাচ্চা।

—আপনার রিং করে জানানোর কথা ছিল···

—ভুলে গিয়েছিলাম। দুঃখিত।

—কর্নেল সরকারের সঙ্গে কথা বলুন।

—দরকার হলে বলব। এখন আমি ব্যস্ত। সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভের সঙ্গে আলোচনা করছি। ধন্যবাদ। শেখ সায়েব ফোন রেখে দিলেন। অদ্ভুত লোক তো! তবে হাসি পেল, হালদারমশাই ওঁর সুইটে হাজির হয়েছেন এবং নিশ্চয় গুরুগম্ভীর আলোচনা চলেছে।

কর্নেল বললেন—হাসছ কেন জয়ন্ত ?

—হালদারমশাই শেখ সায়েবের ডেরায় গিয়ে জুটেছেন। আবার কী কেলেংকারি ঘটে যাবে কে জানে !

—আপাতত তেমন কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। শেখ সায়েবের কোনও বিপদ ঘটারও চান্স নেই।

—কেন নেই ?

—হারানো মুক্তো উনি যতক্ষণ না ফিরে পাচ্ছেন, ততক্ষণ উনি নিরাপদ। তা ছাড়া উনি এ ব্যাপারে পুলিশকে এড়িয়ে চলেছেন। কাজেই ওঁকে নিয়ে কারও কোনও ঝক্কি নেই।

—উনি আপনার কাছে এসেছিলেন খুনীরা এটা টের পেয়ে গেছে।

—তাতে কী ? কেস তো নিয়েছেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদার-মশাই। খুনী যে-ই হোক, সে হালদারমশাইকে তত পরোয়া করে না। করলে ওঁর এজেন্সির কাছে ওঁর চোখের সামনে হরনাথ চন্দ্রকে কিডন্যাপ করার সাহস পেত না।

কর্নেল ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। আপনমনে বললেন—সময় বড় দ্রুতগামী ! বলে ভেতরে চলে গেলেন।

একটু পরে পোশাক বদলে বেরিয়ে এলেন। চলো জয়ন্ত ! বেরুনো যাক।

—গোয়েন্দাগিরিতে ?

কর্নেল হাসলেন।—নাহ্। পরমেশবাবুর বাড়িতে একটা দুর্লভ প্রজাতির অর্কিড লক্ষ্য করেছি। বেচারা আধমরা অবস্থায় পাথরের ফাঁকে পড়ে আছে। একটা ফোয়ারার গায়ে পাথরের ক্ষুদে কৃত্রিম পাহাড় ছিল একসময়। এখন আগাছায় ঢাকা পড়েছে। বেচারাকে উদ্ধার করা উচিত।

এবারও শর্টকাটে অলিগলি ঘুরে সেই বাড়ির সামনে পেঁছুলাম। গেট আগের মতোই ভেতর থেকে তালাবন্ধ। হর্ন শুনে মধু এসে তালা খুলে দিল। লোকটা কেমন যেন নির্বিকার। প্রস্তরভাস্কর্যের মতো।

আমাদের গাড়ি পোর্টিকোর তলায় পেঁছুলে মধু ফিরে এল। বলল কর্তামশাই আমার ওপর খাপ্পা হয়ে আছেন। দিদিমণির পেটে

কথা থাকে না। খিড়কির দরজা খোলা থাকার কথা ওঁকে কেন বলিনি সেই জন্য আমাকে পুলিশে দেবেন বলে শাসাচ্ছেন। ওঁকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যেন স্যার !

হলঘরের সিঁড়ির মাথায় মিমিকে দেখা গেল। চেহারায় এখন অনেকটা শান্ত ভাব। ঘটনাটা সামলে উঠেছে এতক্ষণে। ম্লান হেসে বলল—আসুন কর্নেলসায়েব। জানালা থেকে আপনাদের দেখতে পেয়ে...

কর্নেল বললেন—তোমার জ্যাঠামশাই নাকি মধুর ওপর খাপ্পা ?

—আমার ওপরও। এতক্ষণ ধরে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করেছি। আসুন।

মধু বলল—আমি নীচেই থাকছি দিদিমণি !

মিমি আমাদের ওপরে নিয়ে গেল। সেই ঘরের চওড়া ব্যালকনিতে একটা হুইল চেয়ারে বসে ছিলেন পরমেশ। কর্নেলকে দেখে উত্তেজিতভাবে বললেন—মেঘ না চাইতেই জল ! ওই হারামজাদা নেমকহারাম মধুটাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব ভাবছিলাম। ডিসিশন নিতে পারছিলাম না। আপনি এসে ভালই হয়েছে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার শুনুন।

মিমি দ্রুত দুটো হালকা বেতের চেয়ার এনে দিল। আমরা বসলাম। কর্নেল বললেন—খিড়কির দরজা যে রাত্রে খোলা ছিল, সকালেই মিমি আমাদের বলেছে। আসলে আপনাকে বলে অকারণে উদ্বিগ্ন করতে চায়নি ওরা। তা ছাড়া যা হবার হয়ে গেছে। এখন ও নিয়ে আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

—পুলিশকে এটা জানানো উচিত তা হলে !

—আমিই সময়মতো জানাব। ভাববেন না।

—মিমি ! কর্নেলসায়েবের জন্য কফি।

কর্নেল হাত তুলে বললেন—একটু পরে। আপাতত যেজন্য এসেছি, বলি। আপনার বাগানের ফোয়ারার ধারে একটা অর্কিড পেয়েছি। আপনি তো জানেন আমি অর্কিডলোভী !

পরমেশ হাসবার চেষ্টা করে বললেন—আমিও তা-ই ছিলাম। এখন সবই অতীতের মিথ্যা স্মৃতি। আপনি স্বচ্ছন্দে ওটা নিয়ে

যেতে পারেন। মিমি, কর্নেলসায়েবকে নিয়ে যা।
উঠে আসার সময় লক্ষ্য করলাম পরমেশের মুখে বিকৃতি ফুটে উঠেছে। জীবনের সবকিছুর ওপর এই অভিজাত মানুষটি যেন বীতস্পৃহ।
ঘাস আর ঝোপঝাড়ের ভেতর একফালি পায়ে চলা পথ। একটু এগিয়ে বাঁদিকে চৌকো ডোবা, সেটা একসময় সুইমিং পুল ছিল। বর্মী বাঁশের ঝাড় পেরিয়ে গিয়ে পোড়ো ফোয়ারা দেখতে পেলাম। গোলাকার বিরাট চৌবাচ্চার তলায় জল শুকিয়ে কাদা আর শ্যাওলা জমে আছে। মধ্যিখানে ফুট দশ-বারো উঁচু টুকরো কালো পাথরের ঢিবি। পাথরের ফাঁকে ঝোপঝাড় উলুঘাস গজিয়েছে। কর্নেল চৌবাচ্চা ডিঙিয়ে ঢিবিতে গেলেন। তারপর পাথরের ফাঁক থেকে বিবর্ণ একটা অর্কিড উপড়ে তুললেন। বললেন—অর্কিডের প্রাণ শক্তি। কাজেই শিগগির এটা রঙ ফিরে পাবে। আশাকরি, এপ্রিলেই ফুল ফোটাতে পারব।
মিমি অবাক চোখে দেখছিল। বলল—আমি কিন্তু ওটা লক্ষ্যই করিনি।
কর্নেল এসে বললেন—চলো! খিড়কির দরজাটা একটু দেখে যাই।
ঝোপঝাড়ের ভেতর পায়ে চলা পথটা বেঁকে গেছে। আবর্জনার দুর্গন্ধ নাকে এসে ঝাপটা দিল। নাকে রুমাল গুঁজে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। কর্নেলকে মিমি নিয়ে গেল দরজাটার দিকে।
ভাবছিলাম, এই জঙ্গল এরা সাফ করে না কেন? চোর ডাকাত দিনদুপুরেই দিব্যি এখানে গা ঢাকা দিয়ে ওত পেতে থাকতে পারে। মধু লোকটাকে দেখে কুঁড়ের রাজা মনে হয়। কিন্তু মিমির তো এ সব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা উচিত।
ঝোপের ফাঁকে দেখা যাচ্ছিল কর্নেল খিড়কির দরজা খুলছেন। তারপর ওদিকে অদৃশ্য হলেন। মিমিও আমার মতো নাকে আঁচল গুঁজে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।
আলো কমে এসেছে। আমার বাঁদিকে একটা করবী ঝোপ আগাছার ব্যূহ থেকে মাথা তুলে কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। করবীটি কি ফুল ফোটাতে পারে? হয় তো এই পরিবেশ আমাকে এ ধরনের চিন্তা

এনে দিচ্ছিল। পুরনো আমলের বর্ণাঢ্য এবং সাজানোগোছানো ফুলবাগিচা, ফোয়ারা, সুইমিং পুল (হয় তো টেনিস লনও ছিল) এইসব দৃশ্য কল্পনা করছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল করবী ঝোপের তলায় দলাপাকানো একটা কাগজ পড়ে আছে। কাগজটা বেরঙা হলে গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু বহুবছর ধরে এক রহস্যভেদীর সঙ্গগুণ বা সঙ্গদোষে আমার মধ্যেও গোয়েন্দাগিরির প্রবণতা জন্মে গেছে। এগিয়ে গিয়ে কাগজটা কুড়িয়ে নিলাম। ছোট্ট একটা চিরকুট মাত্র। খুলে দেখি লেখা আছে ঃ

রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে আসছি। লক্ষ্য রাখবে। পার্টি টাকা নিয়ে আসবে। যা চেয়েছ, তা-ই পাবে। আশাকরি আমাকে অবিশ্বাস করবে না। তবে কমিশন পাঁচ পার্সেণ্টের কম নয়। রিস্ক আছে।

তলায় ইংরেজিতে ইনিশিয়ালটা খুব অস্পষ্ট। চটপট চিরকুটটা পকেটে ঢোকালাম। কর্নেল এবং মিমি কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছিলেন। উত্তেজনায় আমার শরীর কাঁপছে। ইন্দ্রজিৎ এই চিঠির ফাঁদে পড়েই প্রাণ হারিয়েছে তা স্পষ্ট। কিন্তু চিঠিটা এখানে কে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলল বোঝা যাচ্ছে না।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। তোমাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে জয়ন্ত! আড়ষ্ট হেসে বললাম—বিশ্রি দুর্গন্ধ!

মিমি বলল—হ্যাঁ। পেছনে কর্পোরেশনের ময়লার গাদা। আমারও এদিকটায় এসে গাগুলোয়। তাই আসি না।

আমরা দোতলায় সেই চওড়া ব্যালকনিতে ফিরে গেলাম। হুইল-চেয়ারে বসে পরমেশ কী একটা বই পড়ছিলেন। একটা হাত দিয়ে বইয়ের পাতা ওল্টানো অভ্যাস করেছেন। বুজিয়ে রেখে বললেন—কোনও ক্লু পেলেন কর্নেলসায়েব?

কর্নেল সহাস্যে অর্কিডটা দেখিয়ে বললেন—এটাই আমার ক্লু!

পরমেশ অবাক চোখে তাকালেন! —তার মানে?

—আপনার অতীত জীবনকে চিনিয়ে দেয়। একজন প্রকৃতিপ্রেমীর জীবনকে।

পরমেশ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন সব মিথ্যা হয়ে গেছে।

মিমি ! এবার কফি নিয়ে আয় !
মিমি চলে গেল। কর্নেল ক্যাকটাস নিয়ে বকবকানি শুরু করলেন পরমেশের সঙ্গে। আলো কমে ধূসরতা ঘনিয়েছে এতক্ষণে। হঠাৎ নীচে মধুকে বাগানের দিকে দৌড়তে দেখলাম। সে চেঁচাচ্ছিল—চোর ! চোর ! চোর !
পরমেশ প্রায় গর্জন করলেন— মিমি ! আমার বন্দুক নিয়ে আয় !
খিড়কির ওধারে বস্তিতে শোরগোল উঠল। বোঝা গেল চোর ওই দরজা খুলেই ওদিকে পালাচ্ছে। কর্নেল বাইনোকুলারে ওদিকটা দেখতে থাকলেন। রহস্যময় বলতে হবে। কেউ বাগানের ঝোপে লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। কে কে ? কী উদ্দেশ্যে ওখানে লুকিয়ে ছিল ?

চার

চোর' কি ইন্দ্রজিৎকে লেখা চিঠি খুঁজতে এসেছিল ? আমার মাথায় এই প্রশ্নটা রহস্যের জাল বুনছিল। কিন্তু পরমেশ, মিমি এবং মধুর কাছে জানা গেল, এ বাড়িতে নাকি প্রায়ই চোর ঢোকে। হানাবাড়ির মতো বাড়ি। পিছনে বস্তি এলাকা। চোরেদের উৎপাত স্বাভাবিক। তাছাড়া গাঢাকা দেওয়ার মতো আড়ালও প্রচুর।
তবে মধু খুব কড়া নজরদার। অন্তত যতক্ষণ তার ঘুম আসে না, ততক্ষণ তো বটেই। শুধু একটাই সমস্যা। মধু ঘুমিয়ে পড়লেই একেবারে মড়া হয়ে যায়। পরমেশের মতে, সে নির্ঘাৎ গাঁজা গুলি বা আফিং ধরেছে ইদানিং। কারণ আগে মধুর ঘুম এমন গাঢ় ছিল না।
ইতিমধ্যে পাড়ার ছেলেরা এসে ডাকাডাকি করছিল মিমিদিকে। মর্গে ইন্দ্রজিতের লাস ডেলিভারি দেবে সন্ধ্যা সাতটায়। মিমি তাদের সঙ্গে মধুকে পাঠিয়ে দিল। পরমেশ খাপ্পা হয়ে বললেন—ইন্দ্রটা মরেও আমাকে জ্বালাচ্ছে। মর্গ থেকে লাস আনো। শ্মশানে যাও। মিমি ! গেটে তালা এঁটে দিয়েছিস তো ?
কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।—চলি পরমেশবাবু !

পরমেশ বললেন—হ্যাঁ। আপনাকে আর কষ্ট দিতে চাইনে। আমার শরীরও কেমন করছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকব।

মিমি গেটের তালা খুলতে নীচে নামল। বলল—জ্যাঠামশাই পাড়ার কারও সঙ্গে মেশেন না। তাই আমাকেই সবার সঙ্গে ভাব রেখে চলতে হয়। ক্লাবের ছেলেদের আমি হাতে রেখেছি। আপদে-বিপদে তারাই ছুটে আসে। তারা না থাকলে কী হত ভাবুন। ইন্দ্রদার বডি মর্গ থেকে ডেলিভারি নেওয়া, শ্মশানে যাওয়া—জ্যাঠামশাই তো এসব কথা ভাবেন না।

আমাদের গাড়ি গেট দিয়ে বেরুনোর সময় দেখলাম, গেটের পাশে দাঁড়িয়ে এক যুবক সিগারেট টানছে। সে ডাকল—মিমি!

মিমি বলল—গৌরদা, তুমি ওদের সঙ্গে যাওনি?

সে কী বলল শোনা গেল না। বড় রাস্তায় পৌঁছে বললাম—মিমির প্রেমিক। বাজি রেখে বলতে পারি।

বৃদ্ধ রহস্যভেদী শুধু বললেন—হুঁ।

রাস্তায় যেতে যেতে সেই চিঠিটা গুঁজে দিলাম কর্নেলের হাতে। ড্যাশবোর্ডের আলোয় চিঠিটা পড়ে উনি সহাস্যে বললেন—বাঃ! তুমি একজন খাঁটি গোয়েন্দার কাজ করেছ, ডার্লিং! সত্যি বলতে কি, এই ধরনের কোনও ক্লু খুঁজতেই আমি এসেছিলাম। কিন্তু আমার ধারণা ছিল, এই অর্কিডটার কাছেই তেমন কিছু পেয়ে যাব।

বলে যত্নে হাতে রাখা ম্রিয়মান অর্কিডটা তুলে ধরলেন। একটু অবাক হয়ে বললাম—আপনি জানতেন এমন একটা চিঠি……

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—চিঠি বলিনি। কোনও ক্লু।

—কিসের ক্লু?

—ইন্দ্রজিতের সঙ্গে কারও নৈশ অ্যাপয়েন্টমেন্টের। যাই হোক, তুমি এটা কোথায় পেলে?

—যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার কাছেই একটা করবী ঝোপের তলায়। আসলে দলাপাকানো টাটকা কাগজ দেখেই একটু কৌতূহল হয়েছিল।

—নিশ্চয় ভেবেছিলে মিমিকে লেখা কারও প্রেমপত্র?

কর্নেল হা হা করে হাসলেন। বললাম—আমি মোটেও প্রেমপত্রের

কথা ভাবিনি। কিন্তু আপনি এই অর্কিডের কাছে এমন কিছু থাকার কথা কেন ভেবেছিলেন ?

কর্নেল হঠাৎ গুম হয়ে গেলেন। একটু পরে বললেন—জানি না। বরাবর আমার এটা হয়। কোনও রহস্যময় ঘটনার পর কোথাও অর্কিড বা ক্যাকটাস দেখতে পেলেই মনে হয়, ওরা আমাকে কোনও ক্লু দেবে। দেয়ও। আসলে আমার প্রতিপক্ষ কিংবা কোনও গুপ্ত হিতৈষী আমার এই স্বভাবটা জানে। জানে আমি অর্কিড বা ক্যাকটাস দেখলেই সেখানে ছুটে যাব। তবে মজাটা হল, প্রতিপক্ষ ক্লু দেয় ভুলপথে ছোটাতে। আর গুপ্ত হিতৈষী দেয় সঠিক পথের খোঁজ। শুধু বুঝতে পারছি না, এ ক্ষেত্রে তোমার চোখে পড়ার মতো জায়গায় ক্লু রাখল কেন ?

—কী আশ্চর্য! কেউ কি জানত আমি ঠিক ওখানেই দাঁড়াব ?

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জেবলে বললেন—জানত না। জেনেছিল।

—উঃ! বড্ড হেঁয়ালি করছেন বস্!

তুমি ভুলে যাচ্ছ, ও বাড়িতে তারপরই মধু সো-কল্ড চোর দেখতে পেল।

—মাই গুডনেস! তার মানে আপনি বলতে চাইছেন আমাকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই লোকটা আড়াল থেকে এই চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলেছিল ?

—আপাতদৃষ্টে তা-ই মনে হচ্ছে।

—কিন্তু আমি একটুও শব্দ শুনিনি। দলাপাকানো কাগজ পড়ারও একটা শব্দ হবে।

—বাতাস বইছিল। গাছপালায় শব্দ হচ্ছিল। তাই শুনতে পাওনি।

চুপ করে গেলাম। আমি কী বোকা! তখন যদি একটু নজর রাখতাম চারদিকে! কিছুক্ষণ পরে কর্নেলের বাড়ির লনে পেঁছে বললাম—লোকটা আপনার স্বয়ং প্রতিপক্ষ না গুপ্ত হিতৈষী, কর্নেল ?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—এখনও জানি না।

তিনতলার অ্যাপার্টমেণ্টে ডোরবেলের সুইচ টেপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীচরণ দরজা খুলে চাপা গলায় বলল—এক ভদ্রলোক এয়েছেন। আপনি যাওয়ার পর 'নালবাজারের নাহিড়িসায়েব ফোং' করে বললেন, এক ভদ্রলোক যাচ্ছেন। আপনি না আসা অব্দি যেন বসিয়ে রাখি।

ষষ্ঠী ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়িকে 'নালবাজারের নাহিড়ি-সায়েব' এবং ফোনকে 'ফোং' বলা আজও ছাড়তে পারেনি। কর্নেল চোখ কটমট করে বললেন—কফি।

—দিয়েছি বাবামশাই।

আবার দে।

ষষ্ঠী বেজার মুখে কিচেনের দিকে চলে গেল। ড্রয়িংরুমে ঢুকে দেখলাম, গোবেচারা চেহারা কিন্তু ধোপদুরস্ত পোশাকপরা মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক বসে আছেন। কর্নেলকে দেখে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে নমস্কার করলেন। বললেন—ডি সি ডি ডি লাহিড়ি-সায়েব আপনার কাছে আসতে বলেছেন।

কর্নেল বললেন—বসুন। আসছি।

অর্কিডটা নিয়ে উনি অদৃশ্য হলেন। বুঝলাম ছাদের বাগান 'শূন্যোদ্যানে' ওটার পুনরুজ্জীবনের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কি কর্নেল সায়েবের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট?

মনে মনে চটে বললাম—না। আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।

ভদ্রলোক নমস্কার করে বললেন—কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য!

অবাক হয়ে বললাম—কেন বলুন তো?

—আমি সত্যসেবক পত্রিকার ফ্যান স্যার! আপনার লেখা গাল্ফ ওয়রের রিপোর্ট—ওঃ! অনবদ্য!

—গাল্ফ ওয়রের একটা রিপোর্টই আমি লিখেছিলাম। ইন্দ্রজিৎ রায়কে নিয়ে—

—সেইটের কথাই বলছি স্যার! মানে, আমাদের আবার ওই এরিয়ায় কারবার কি না। তাই কী দুর্ভাবনায় না কাটিয়েছি। তবে যাই

বলুন স্যার, বুশ মুখের মতো জবাব দিয়েছেন সান্দামকে। নাকে ঝামা ঘষে দেওয়া একেই বলে।

—আপনার পরিচয় এখনও পাইনি।

সরি! মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা। আমার নাম স্যার কুঞ্জনাথ চন্দ্র। জুয়েলার চন্দ্র ব্রাদার্স আছে বউবাজারে। বিজ্ঞাপনে নাম দেখে থাকবেন।

দ্রুত বললাম—বুঝেছি। আপনিই হরনাথবাবুর ভাই?

—আজ্ঞে। দাদাকে নিয়ে আজ সারাটা দিন যা গেল! কর্নেল সায়েবের কাছে শুনে থাকবেন হয়তো।

—শুনেছি। হরনাথবাবুর খোঁজ পেলেন?

কুঞ্জনাথ গম্ভীর মুখে বললেন—সব বলছি। কর্নেলসায়েব আসুন।

'কর্নেলসায়েব' এসে গেলেন সেই মুহূর্তে। ইজিচেয়ারে বসেই বললেন—আপনি কুঞ্জনাথবাবু?

কুঞ্জনাথ ব্যস্তভাবে পকেট থেকে একটা খাম বের করে বললেন—এটা জেরক্স কপি। আমি থানায় যাওয়ার সময় দোকানে কে দিয়ে গেছে। কী সাংঘাতিক ব্যাপার দেখুন।

কর্নেল খামটা নিয়ে খুলতে খুলতে বললেন—আসল কপিটা থানায়?

—হ্যাঁ স্যার! থানায় দিয়েছি। তারপর আমাদের কোম্পানি অ্যাটর্নি রামজয়বাবু আমাকে ডি সি ডি ডি-র কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। উনি আপনার কাছে আসতে বললেন।

কর্নেল খাম থেকে একটা চিঠি বের করে পড়ছিলেন। আমাকে দিয়ে একটু হেসে বললেন—রিয়্যাল লাইফ ড্রামা, জয়ন্ত!

চিঠিতে আঁকাবাঁকা হরফে ইংরেজিতে যা লেখা আছে, বাংলায় তা এরকম:

হরনাথ চন্দ্রকে আমরা অপহরণ করেছি। মালের দাম প্রায় ২ কোটি টাকা। মাত্র ৫ শতাংশ চাই। সাতদিন সময়। আগামী রবিবার রাত ১২টা পর্যন্ত কাঁটায়-কাঁটায়। নগদ টাকা প্ল্যাস্টিকের থলেয় ভরে চোরাডিহার বজরঙ্গবলী থানে রেখে আসতে হবে। আসানসোল

গয়া রেলপথে চোরডিহা। স্টেশন থেকে জঙ্গলের ভেতর থানের দূরত্ব এক কিমি। পুলিশ থাকলে জেনে যাব। হরনাথও বেঁচে থাকবে না।

চিঠি ফেরত দিয়ে বললাম—সর্বনাশ!

কুঞ্জনাথ প্রায় আর্তনাদ করলেন—সর্বনাশ মানে মহা সর্বনাশ! অত ক্যাশ টাকা না হয় যোগাড় করা গেল। কিন্তু অতদূর নিয়ে যাওয়া! তারপর বিশ্বাসই বা করি কী করে? তাছাড়া ২ কোটির টাকার মালই বা কী? কিছু বুঝতে পারছি না। আমার দাদা সবসময় কী সব কেলো করে বেড়ায় কে জানে? এদিকে বউদির অবস্থা শোচনীয়। নার্সিং হোমে ভর্তি করতে হয়েছে। ওঃ! দাদাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

কর্নেল বললেন—আপনার দাদা আমার চেনা লোক। দুবছর আগে আপনাদের কোম্পানির একটা হীরের নেকলেস রং ডেলিভারি হয়েছিল। হারানো নেকলেস উদ্ধারের সূত্রে ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ।

কুঞ্জনাথ নড়ে বসলেন।—তাহলে আপনিই স্যার ওটা উদ্ধার করে দিয়েছিলেন? দাদা আমাকে আপনার কথা বলেনি। আমি ভেবেছিলাম পুলিশই উদ্ধার করেছে। আমার দাদা বড্ড অদ্ভুত লোক।

ষষ্ঠী কফি রেখে গেল। কুঞ্জনাথ আর কফি খেলেন না। কর্নেল কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন—কী করবেন ঠিক করেছেন কুঞ্জবাবু? কুঞ্জনাথ করুণ মুখে বললেন—ঠাকুরের আশীর্বাদে টাকা আমাদের হাতের ময়লা। ডি সি ডি ডি সায়েব বলেছেন, আপনি যা বলবেন তাই করব।

—যদি বলি টাকা দিয়ে দাদাকে উদ্ধার করে আনুন!

কুঞ্জনাথ চমকে উঠলেন।—ওরে বাবা! অত ক্যাশ নিয়ে আমি চোরের মুল্লুকে যাব? চোরডিহা নামেই বোঝা যাচ্ছে সাংঘাতিক জায়গা। তার ওপর জঙ্গলের ভেতর বজরঙ্গবলীর থান। ওরে বাবা!

—সঙ্গে সাহসী লোক পেলে আপনি যেতে রাজি?

কুঞ্জনাথ গোল চোখে তাকিয়ে কথাটা যেন বাজিয়ে দেখলেন।—সাহসী লোক?

—হ্যাঁ। সাহসী লোক।

—তেমন লোক পাচ্ছি কোথায়? আজকাল কাকেও বিশ্বাস করা যায় না।

কর্নেল একটু হেসে আমাকে দেখিয়ে বললেন—জয়ন্ত খুব সাহসী। ওর রিভলভারও আছে।

হাত নেড়ে বললাম—অসম্ভব! আমি একা কিছুতেই যাব না।

কর্নেল চোখ নাচিয়ে বললেন—আমি সঙ্গে গেলে?

—আপনি সঙ্গে থাকলে আমি নরকে ঝাঁপ দিতে রাজি।

কর্নেল তাঁর প্রসিদ্ধ অট্টহাসি হাসলেন। কুঞ্জনাথ আরও করুণ মুখে বললেন—টাকার ব্যাপারে আমি স্যার রেডি। কিন্তু বলছিলাম কী, দাদাকে কি অন্য কোনওভাবে বদমাসদের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবেন না? ডি সি ডি ডি সায়েব সেইরকম আভাস দিলেন বলেই—

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন—আচ্ছা কুঞ্জবাবু! মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির সঙ্গে আপনাদের কারবার আছে?

কুঞ্জনাথ হকচকিয়ে গেলেন প্রথমে। তারপর সামলে নিয়ে আস্তে বললেন—আছে। খুলেই বলি স্যার। ওরা গাল্ফ থেকে র মেটিরিয়্যালস সাপ্লাই করে। স্মাগলিং র‍্যাকেট আছে। নানারকম জুয়েলস আমাদের হাতে এসে গয়নাগাটি হয়। গোল্ড বিস্কিট আর পার্ল্‌ই বেশি আসে। দয়া করে এ সব কথা যেন পুলিশকে বলবেন না স্যার!

—পুলিশ জানলেও মুখ বুজে থাকবে। বড়-বড় পলিটিক্যাল চাঁই আণ্ডার গ্রাউণ্ডের মুরুব্বি। বোম্বের আণ্ডার গ্রাউণ্ডের খবর আমার চেয়ে আপনিই বেশি জানেন। পলিটিক্যাল পার্টি চাঁদা পেলেই খুশি।

কুঞ্জনাথ হাসবার চেষ্টা করে বললেন—পার্টি ফাণ্ডে চাঁদাটাদা দাদাই দেয়। ইলেকশনের সময় থেকে টাকা দিতে হয়। বুঝতেই পারছেন কী অবস্থা। তবু পুলিশের হাঙ্গামা যে হয় না, এমন নয়।

—আপনি বনানী সেনকে চেনেন ?

কুঞ্জনাথ আবার তেমনি গোল চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন—চিনি। সে দাদার নামে কিছু লাগিয়েছে নাকি স্যার ?

—নাহ ! কর্নেল চুরুটের কেস থেকে একটা চুরুট বের করলেন। ফের বললেন—ইন্দ্রজিৎ রায় একসময় আপনাদের অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ছিল। তাই না ?

কুঞ্জনাথ কর্নেলের প্রশ্নে আরও হকচকিয়ে গেলেন।—ছিল। তবে সে তো ক'বছর আগের কথা। তাকে আমাদের বোম্বে ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার করেছিল দাদা। সেখানে ক্যাশ তছরুপ করে গা-ঢাকা দিয়েছিল বোম্বে ব্রাঞ্চে আমি খুব কম গেছি। দাদাই যাতায়াত করে। ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের কাছে আজ সব শুনে···

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন—আপনি শংকর হাজরা নামে কাকেও চেনেন ?

কুঞ্জনাথ বিব্রতভাবে বললেন, কেন এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন স্যার ?

—চেনেন কি না বলুন কুঞ্জবাবু !

একটু চুপ করে থেকে ফোঁস শব্দে শ্বাস ছেড়ে কুঞ্জনাথ বললেন—বোম্বে ব্র্যাঞ্চে ছিল। আমাদের খুব বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল স্যার। বোম্বেতেই কবছর আগে মার্ডার হয়ে যায়। মার্ডার আর ধরা পড়েনি।

—শংকরবাবু খুন হওয়ার আগে না পরে ইন্দ্রজিৎ ট্রান্সফার হয়েছিল ?

—পরে। কুঞ্জনাথ কাঁচুমাচু মুখে বললেন—দাদাকে কিডন্যাপ করার সঙ্গে কি এসবের সম্পর্ক আছে স্যার ?

কর্নেল চুরুটে ধোঁয়ার মধ্যে বললেন—থাকতে পারে, না-ও পারে। তবে আমার এসব কথা জানা দরকার। আপনি শুনলে অবাক হবেন, আপনার দাদা শেখসায়েবকে নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ যে চন্দ্র জুয়েলার্সের কর্মচারী ছিল আমাকে বেমালুম গোপন করেছিলেন।

কুঞ্জনাথ বলে উঠলেন—দাদা স্যার বরাবর বড্ড প্যাঁচালো মানুষ।

পেটে এক কথা, মুখে আরেক কথা। এতদিনে উচিত শিক্ষা পাচ্ছে। এদিকে আমার হয়েছে জ্বালা।

—তা বলে টাকা দিতে আপনি রাজি?

—বললাম তো স্যার! কুঞ্জনাথ আবার করুণ মুখে বললেন—দাদার একটা কিছু হয়ে গেলে আমি পড়ব অথৈ জলে। বিজনেসের কোথায় কী লেনদেন আছে, আমি স্পষ্ট জানি না। কে কোথায় আমাকে একা পেয়ে ফাঁসিয়ে দেবে সেই নিয়ে যত দুশ্চিন্তা আমার। তার ওপর গাল্ফ ওয়রের ধাক্কায় বিজনেসের কোন জায়গায় যা লেগেছে, দাদা আমাকে কিছুই জানায়নি।

—ডিটেকটিভ ভদ্রলোক কী বললেন?

—মাথায় ছিট্ আছে স্যার! দুপুরে থানা থেকে সেই যে আসছি বলে চলে গেলেন তো গেলেন। পুলিশ অফিসাররা হাসাহাসি করছিলেন। দাদার যত অদ্ভুত কাণ্ড! এ কি প্রাইভেট ডিটেক-টিভের কাজ?

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন—ঠিক আছে। আপনি আসুন। এখনও তো হাতে সময় আছে। আমিই আপনাকে রিং করে জানাব কী করতে হবে।

কুঞ্জনাথ প্রায় পালিয়ে বাঁচার ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন। তারপর স্তব্ধতা ভেঙে টেলিফোন বাজল।

কোনও-কোনও সময় টেলিফোনের শব্দ বিরক্তিকর। কর্নেলকে ধ্যানস্থ দেখে আমিই ফোন তুলে সাড়া দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শেখসায়েবের গালাগালি খেলাম—কিশ! করিব্! কল্ব্!

—শেখসায়েব নাকি? বাংলায় প্রশ্নটা করেই শুধরে নিলাম ইংরেজিতে।

সগর্জনে শেখসায়েব বললেন—চোরদের শাস্তি হাত কেটে নেওয়া। খুনীর শাস্তি চৌরাস্তায় নিয়ে গিয়ে গর্দানে কোপ। হিন্দুস্তানে সবই উল্টো।

—কী হয়েছে শেখসায়েব?

—কর্নেল সরকার! আমার সুইটে চোর ঢুকেছিল। আমাকে খুন করতে ছুরি তুলেছিল।

—এক মিনিট ! কর্নেলকে দিচ্ছি।

কর্নেল ফোন নিয়ে সাড়া দিয়ে বললেন—বলুন শেখসায়েব !··· জয়ন্ত চৌধুরি ফোন ধরেছিল—সাংবাদিক···হুঁ ! বলেন কী ! তারপর···হুঁ···কর্নেল একটানা হুঁ দিতে থাকলেন। একসময় বললেন ঠিক আছে। সাবধানে থাকুন। আই হোলে দেখে তবে দরজা খুলবেন।···শুভরাত্রি ! বলে ফোন রেখে দিলেন কর্নেল।

উত্তেজনায় ছটফট করছিলাম। বললাম—কী হয়েছে ?

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জেবলে একটু হাসলেন।—হোটেল কণ্টিনেণ্টালে নেহাত চোরের উৎপাত অস্বাভাবিক। প্রতি ফ্লোরের করিডরে ওয়াকিটকি হাতে সিকিউরিটি গার্ড ঘুরে বেড়ায়। অথচ শেখসায়েবের ঘরে চোর ঢুকল কী করে ? শেখসায়েব বাথরুমে ছিলেন। বেরিয়েই দেখেন কে ওঁর বিছানা হাতড়াচ্ছে। ওঁকে দেখে লোকটা ছুরি বের করে। শেখ সাহেব বুদ্ধিমান। বাথরুমে ঢুকে পড়েন তক্ষুণি। বাথরুমে অ্যালার্ম সুইচ আছে। সুইচ টেপার পর হুলুস্থুল শুরু হয়। তবে চোর নিপাত্তা হয়ে যায়। বিছানাপত্র ওলটপালট। কী খুঁজতে এসেছিল বলা কঠিন। পেট্রোডলার কি ? মনে হয় না। কারণ শেখসায়েব ট্র্যাভেলার্স চেক নিয়ে এসেছেন। খুচরো টাকাকড়ি হারায়নি। অন্য কিছু হারিয়েছে কিনা শেখসায়েব এখনও জানেন না। নীচের লাউঞ্জে এসে আমাকে সরাসরি ফোন করছিলেন।

—চোর সুইটে ঢুকল কী করে ? ইণ্টারলকিং সিস্টেম থাকা উচিত দরজায়।

—আছে। তবু চোর ঢুকেছে। মুখে মুখোস ছিল।

—তা হলে হোটেলেরই কেউ। ডুপ্লিকেট চাবি হাতিয়ে ঢুকেছিল।

—ডুপ্লিকেট চাবি থাকে ম্যানেজারের কাস্টডিতে। বেসমেণ্টে গুপ্ত ঘরের ভেতর আয়রন সেফে থাকে।

—এ চোর তা হলে নেহাত চোর নয়। ম্যানেজারকে হাত করার ক্ষমতা তার আছে।

কর্নেল কোনও মন্তব্য না করে টেবিলের ড্রয়ার থেকে আতস কাচ বের করলেন। আমার পাওয়া এবং কুঞ্জনাথের দিয়ে যাওয়া জেরক্স

করা চিঠি আতস কাচের তলায় রেখে ঝুঁকে বসলেন।

টানা উত্তেজনার পর ক্লান্তি এসেছিল। হাই তুলে বললাম—আমি চলি এবার।

—উঁ?

—বড্ড টায়ার্ড। বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়তে চাই।

—হুঁ।

আমার রহস্যভেদী বন্ধু বিদায়সম্ভাষণ করলেন না। বুঝলাম না একটা বাংলা এবং একটা ইংরেজি চিঠির মধ্যে কী মিল আবিষ্কার করতে চাইছেন উনি? ওঁর আচরণের মাথামুণ্ডু খুঁজে পাই না অনেক সময়। উনি নিজেই কতবার কত রহস্যের পেছনে ছোটাছুটি করে বিরক্ত হয়ে বলেছেন—ব্যাপারটা চেইজিং আফটার আ রেড হেরিং হয়ে গেল, ডার্লিং! যা নেই, তার পেছনে ছোটা। এবারও রেড হেরিং মাছের দিকে ছুটে চলেছেন না তো?

ইস্টার্ন বাইপাসে পৌঁছে ব্যাকভিউ মিররে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম পার্ক স্ট্রিটের মোড়ে যে লাল মারুতিটা আমার ফিয়াটের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল সিগন্যালের অপেক্ষায়, সেই গাড়িটাই আমার পেছনে আসছে।

নাকি অন্য কোনও গাড়ি?

ইস্টার্ন বাইপাশে এখন গাড়ি চলাচল কম। মানুষজনও নেই। লাল মারুতি আমার ফিয়াটের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু একটু পরে গতি কমিয়ে দিল এবং আমি সতর্ক না হলে আমার ফিয়াট তাকে গোঁত্তা দিতই।

আমি তাকে পেরিয়ে যেতেই সে আবার গতি বাড়াল। গাড়িটার আচরণ তো ভারি অদ্ভুত। খাপ্পা হয়ে তার নাগাল পাওয়ার জন্য অ্যাকসিলেটারে পায়ের চাপ দিলাম। তারপর দেখলাম গাড়িটা গতি কমিয়েছে। পাশ কাটাতে গিয়ে দেখি গাড়িটা রাস্তার পাশ ঘেঁষে থামছে। লাল জোরালো আলো ফুঁসে উঠল। ব্রেক কষে প্রায় কুড়ি-বাইশ মিটার দূরে গাড়ি দাঁড় করালাম। নিরিবিলি রাস্তা। কুয়াশা নীল হয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। প্যান্টের পকেটে রিভলভার রেডি। লাল মারুতির ভেতর কারা

বসে আছে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তারা কারা আমার জানা দরকার।

পরে মনে হয়েছিল, আমি আসলে প্রচণ্ড ভিতু বলেই ঝোঁকের বশে অতিরিক্ত সাহস দেখাতে যাই।

লাল মারুতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ মাথায় এল, ভুল করেছি। কিন্তু আর কী করা যাবে? কয়েকমিটার দূরে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে (ইংরেজি বাঙালি সন্তানের সাহস বাড়ায়) বললাম—কে তোমরা? কিছু বলার থাকলে বেরিয়ে এস। কিন্তু সাবধান, আমার কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে।

গাড়িটার ইঞ্জিন বন্ধ করা হয়নি। হঠাৎ প্রায় ঝাঁপিয়ে আমার দিকে ছুটে এল। এক লাফে কিনারার ঘাসের ওপর গিয়ে পড়লাম। তারপর রিভলবার বের করেছি, লাল মারুতি উল্টোদিকে ঘুরে উধাও হয়ে গেল।

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম অন্তত মিনিট দুই। তারপর দ্রুত আমার গাড়ির দিকে ছুটে গেলাম। স্টার্ট দিয়ে স্টেডিয়ামের কাছাকাছি পৌঁছে মানুষজনের দেখা পাওয়া গেল। আস্তেসুস্থে ড্রাইভ করছিলাম। তখনও হাত কাঁপছে।

একবার মনে হল আজকালকার আঙুল ফুলে কলাগাছ হওয়া বড়লোকের ছেলেরা নানারকম মস্তানি করে বেড়ায়, এটা তাছাড়া কিছু নয়। আমাকে নিয়ে মজা করে গেল। খুব হাসির ব্যাপার তাদের কাছে।

আবার মনে হল, মুক্তো এবং ইন্দ্রজিৎ হত্যা-রহস্যের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই তো?

কিন্তু যদি সম্পর্ক থাকে, আমার পিছনে লাগতে আসবে কেন?

ফ্ল্যাটে ফিরেই কর্নেলকে রিং করলাম। কর্নেল সব শুনে প্রথমে একচোট হাসলেন। তারপর বললেন—তোমার দুটো ধারণার যে-কোনওটা সত্য, দ্যাট আই এগ্রি। তবে ইন্দ্রজিতের হত্যারহস্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকলে বলব, প্রতিপক্ষ তোমার মাধ্যমে আমাকেই শাসিয়ে গেল। তার মানে, সে বা তারা সরাসরি আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছে না। কিংবা ঝুঁকি নিচ্ছে না। কেন নিচ্ছে না?

এর জবাব হল, সে বা তারা সম্ভবত আমার চেনা লোক।
—সায় দিয়ে বললাম—ঠিক বলেছেন বস্ !
—না। এখনও আমি কোনও সিদ্ধান্ত করছি না। জাস্ট্ অনুমান। এমনও হতে পারে তোমার প্রথম ধারণাটা সত্য। কোনও বখাটে ছোকরার কীর্তি। ইস্টার্ন বাইপাসে প্রায় এ ধরনের ঘটনা নাকি ঘটে। তাই পুলিশ পেট্রলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
—বোগাস ! একটাও পুলিশের গাড়ি দেখলাম না !
—দেখার ব্যাপারটা চান্স জয়ন্ত ! হয় তো এক মিনিট আগে বা পরে পুলিশ পেট্রল পাস করেছে। যাই হোক, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ো ! বিশ্রাম দরকার। কাল থেকে তোমার ওপর দিয়ে সাইমুম বয়ে যাচ্ছে ডার্লিং ! আরবের মরুঝঞ্ঝা !
কর্নেল ফোন রেখে দিলেন। আরও কিছু বলতে চাইছিলাম। সুযোগ পেলাম না। লাল মারুতির নম্বরটা এখনও মাথার ভেতর জ্বলজ্বল করছে। ডায়রিতে লিখে রাখা দরকার।
কিন্তু লিখতে গিয়ে শেষ দুটো সংখ্যা নিয়ে গোলমালে পড়লাম। ৬৭ বা ৭৬ ? গোড়ার দুটো ঠিক আছে। কর্নেলের বাড়ির নম্বর। কাজেই মাথায় বিঁধে গেছে। শেষ দুটো ঝামেলা বাধাল। ঠিক আছে। ৬৭ এবং ৭৬ দুটোই লেখা থাক। আশা করি দুটোই লালরঙের গাড়ি হবে না।
ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। বাথরুম সেরে এসে পোশাক বদলাচ্ছি, টেলিফোন বাজল। কর্নেল ভেবে সাড়া দিলাম। কিন্তু ভেসে এল দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার চিফ অব দা নিউজ ব্যুরো সত্যদার কণ্ঠস্বর।
—জয়ন্ত, তুমি বেঁচে আছ তো ? নাকি খাপি খাচ্ছ ? অ্যাঁ ? তুমি মাইরি নিজেও ডুববে, আমাকেও—
সত্যদার ম্যানারিজম। বললাম—কেন সক্কালবেলা অলক্ষুণে কথাবার্তা সত্যদা ? কী দোষ করেছি ?
—আজকের কাগজ দেখেছ ?
—নাহ্। এখনও দেখিনি।
—সব কাগজ স্টোরিটা দিল। আমরাই মিস করলাম। চিফ

এডিটর এইমাত্র আমাকে রিং করে একচোট নিলেন। নেওয়া উচিত। দোষ তো আমারই যে আমি তোমাদের—মানে তোমার ওপর কড়া হতে পারিনা। আশ্চর্য জয়ন্ত! যে এক্সক্লুসিভ স্টোরি আমরা একমাস আগে নিয়ে প্রেসটিজের চূড়োয় উঠলাম, মাইরি তুমি—ওঃ!

—কোন স্টোরি সত্যদা?

—ন্যাকামি হচ্ছে? গাল্‌ফ ওয়র! অ্যারাবিয়ান নাইটস! ডেজার্ট এক্সিপিডিশন!

সত্যদার তর্জনগর্জন শোনামাত্র বললাম—ইন্দ্রজিৎ রায়ের স্টোরি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কাল কলকাতায় সে খুন হয়েছে। কোথায় ছিলে তুমি? প্রেমিকার সঙ্গে ডুব মেরেছিলে!

—সরি সত্যদা। কাল থেকে আমি মরুঝড়ের বালির তলায় চাপা পড়েছি।

—মরুঝড়ই দেখ জয়ন্ত, জোক করার মুড নেই। মাইরি!

—এগেন সরি সত্যদা! কাল রাতে আমার উচিত ছিল অন্তত ফোনে স্টোরিটা দেওয়া।

কিন্তু ওই যে বললাম মরুঝড়ের কথা। তার ওপর লাল মারুতি!

—শাট আপ! কাল তুমি অফিসে আসোনি! উইদাউট এনি প্রায়র ইনফরমেশন।

—ক্যাজুয়াল লিভের রুলে বলে, উইদিন টোয়েণ্টি ফোর আওয়ার্স—

—আমারে রুল দ্যাখাইও না! আমাদের এক্সক্লুসিভ স্টোরির হিরো মার্ডার হইয়া গেল। আমরা মিস করলাম?

—মরুঝড়! লাল মারুতি!

—অ্যাঁ? কও কী? হোয়াট ইজ দা মিনিং অব মরুঝড় অ্যাণ্ড লাল মারুতি?

—সত্যদা! চিফ এডিটরকে বলুন সুদে আসলে পুষিয়ে দেব?

—তোমার ইয়ারলি ইনক্রিমেণ্ট স্টপ কইর‍্যা দিমু।

বেগতিক বুঝে বললাম—প্লিজ সত্যদা, কর্নেলকে রিং করে ব্যাকগ্রাউণ্ড জেনে নিন।

—কারে ?
কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।
কও কী ? ওই বুড়ারে ? অ্যাঁ ?
হ্যাঁঃ।
ফোন রেখে দিলাম। বলতে পারতাম, লালবাজার থেকে ইন্দ্রজিৎ রায়ের কেস পুলিশই ব্রিফিং করেছে রিপোর্টারদের। সত্যসেবকের এই স্পেশাল রিপোর্টারকেই কি শুধু পুলিশ-স্টোরি নিতে হবে ? অন্য রিপোর্টাররা কী করছিল ? আমার বুঝি অসুখবিসুখ হতে পারে না ?

সমস্যা হল সত্যদাকে কিছু বুঝিয়ে বলা কঠিন। চিফ রিপোর্টার অবনীদার কাছে কথাটা তুলতে হবে। অভিমান ঝেড়ে ফেলে ঝটপট ব্রেকফাস্ট খেলাম। তারপর কর্নেলের বাড়ি ছুটে চললাম। গিয়ে দেখি, কর্নেল টেলিফোনে কার সঙ্গে চাপা স্বরে কথা বলছেন। সোফায় হেলান দিয়ে বসে আছেন বাহারিনের মুক্তোব্যবসায়ী শেখ জুবাইর আল-সাবা। একেবারে ভিজে নেতিয়ে পড়া চেহারা। চোখ দুটো রাঙা। তবে ফোঁস ফোঁস করে শ্বাসপ্রশ্বাস যথারীতি পড়ছে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নিলেন শেখসায়েব। বললাম—গুডমর্নিং! কিন্তু জবাব দিলেন না।
ফোন রেখে কর্নেল আমার দিকে ঘুরলেন। গম্ভীর মুখে বাংলায় বললেন—গতরাতে চোর ঢুকে শেখসায়েবের পাসপোর্ট ভিসা চুরি করেছে। ওঁর হ্যান্ডব্যাগে ছিল। তাই রাতে খেয়াল করেননি। সকালে হ্যান্ডব্যাগ খুলে দেখেন পাসপোর্ট ভিসা নেই।
—তা হলে কি কেউ বা কারা···
আমার কথার ওপর কর্নেল বললেন—কেউ বা কারা চেয়েছে শেখসায়েব যেন এখনই এ দেশ থেকে চলে যান। একজন বিদেশীর পাসপোর্ট ভিসা চুরি গেলে শেষমেষ তাকে ডিপোর্ট করা হবেই। তা ছাড়া গাল্ফ ওয়রে ভারতের ভূমিকায় ইরাক বাদে প্রায় সব আরবদেশ আপাতত অখুশি। শেখসায়েবকে পাসপোর্ট পেতে নিশ্চয় প্রচুর ঘুষ দিতে হয়েছিল। ভিসা দিতে ভারতের অবশ্য

আপত্তি করার কথা নয় কর্নেল শেখসায়েবকে একটা ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে ইংরেজিতে বললেন—এই চিঠি নিয়ে যেভাবে হোক আজই দিল্লি চলে যান। তারপর আমাকে ট্রাঙ্ককলে জানাবেন। আশা করি অসুবিধা হবে না।

শেখ জুবাইর আল-সাবা বিড়বিড় করে মাতৃভাষায় কী বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন।...

পাঁচ

শেখসায়েব চলে যাওয়ার ঘণ্টাদুই পরে কর্নেল আমাকে নিয়ে বেরিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশমতো চৌরঙ্গী এলাকায় একটা বহুতল বাড়ির সামনে পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করালাম। তখনও জানতাম না কোথায় এসেছি। লিফ্‌টে উঠে দশতলায় নেমে দেখি, করিডরের বাঁদিকে একটা বোর্ডে লেখা আছে 'মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সী লিমিটেড'। অমনি বনানী সেনের কথা মনে পড়ে গেল।

কর্নেলকে অনুসরণ করে ভেতরে ঢুকলাম। মোটামুটি প্রশস্ত এবং ছিমছাম সাজানো রিসেপশন রুম। বিজ্ঞাপনের মডেল সুন্দরীদেরই একজন কাউণ্টারে বসে আছে এবং টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে। টেলিফোন রেখে সে কর্নেলের দিকে মধুর হেসে তাকাল।—বলুন স্যার, কী করতে পারি আপনার জন্য?

বাঁধা বুলি এবং বাজারি এটিকেট কর্নেল বললেন—মিঃ প্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—নাম বলুন প্লিজ?

—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—কী কাজ বলুন প্লিজ?

কর্নেল তাঁর নেমকার্ড দিয়ে বললেন—ন্যাচারাল পার্ল সম্পর্কে আমি রিসার্চ করছি। কিছু তথ্য জানতে চাই।

রিসেপসনিস্ট যুবতী কার্ড দেখে বললেন—আপনি নেচারিস্ট?

—হ্যাঁ। নেচার আমার হবি। যা কিছু ন্যাচারাল, তা-ই আমার প্রিয়।

যুবতী আবার মধুর হাসল।—কিন্তু দুঃখিত স্যার! মিঃ প্রসাদ এখন কনফারেন্সে ব্যস্ত। আপনাকে বরং ডেটা রিসার্চ সেকশনের ইন-চার্জ ডঃ সুন্দরমের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছি। অবশ্য জানি না, আপনাকে কোনও তথ্য দেওয়া হবে কি না। আমাদের কম্পানি বাইরে কাকেও তথ্য দেয় না বলেই জানি। এক মিনিট।

বলে সে টেলিফোনে চাপা গলায় কার সঙ্গে কিছু বলল। তারপর কর্নেলের দিকে তাকাল।—আপনি ডঃ সুন্দরমের কাছে যেতে পারেন। বাবুলাল! ইয়ো সাবকো ডঃ সুন্দরমকা কামরা মে লে যাও। আপনি এর সঙ্গে যান।

একজন উর্দিপরা বেয়ারা আমাদের নিয়ে গেল। একটা বড় অপিস ঘর। কম লোক এবং বেশি কাজের জন্য কম্পিউটারে সাজানো। তারপর একটা সংকীর্ণ করিডর। সামনে একটা ঘর। ফলকে লেখা: 'ডেটা রিসার্চ সেকশন।'

ছোট্ট কেবিনে বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার ওধারে শ্যামবর্ণ গুঁফো এক দক্ষিণী-ভদ্রলোক বসে খুটখাট করে বোতাম টিপছিলেন। মুখ তুলে বললেন—বসুন।

আমরা বসলাম। কর্নেল পকেট থেকে নেমকার্ড বের করছিলেন। ডঃ সুন্দরম দ্রুত বললেন—পেয়ে গেছি।

উনি কর্নেলের কার্ডের একটা জেরক্স কপি দেখিয়ে ঠোঁটের কোনায় হাসলেন। বুঝলাম এই অফিসে যন্ত্রই আসল কর্মী। রিসেপসনিস্ট যুবতী কম্পিউটারের সাহায্যে মুহূর্তেই কাজটা করে দিয়েছে।

কর্নেল অমায়িক হেসে বললেন—সময় থেকে আপনারা অনেক এগিয়ে আছেন। অভিনন্দন!

—ধন্যবাদ। বলুন কী করতে পারি?

—প্রাকৃতিক মুক্তো সম্পর্কে আমি গবেষণা করছি। কেরালা উপকূলে আমি কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, গালফ অঞ্চলে যাব। কিন্তু যুদ্ধ বেধে গেল। তো আমি শুনেছি, ওই এলাকার তথ্য আপনাদের কাছে আছে। তাই—

বাধা দিয়ে ডঃ সুন্দরম বললেন—কর্নেল সরকার। আপনি বললেন,

সময়ের চেয়ে আমরা এগিয়ে আছি। খাঁটি কথা বলেছেন। আপনি কেন এখানে এসেছেন তা আমরা জানি। আপনার সঙ্গী ভদ্রলোক কে, তা-ও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু দুঃখিত কর্নেল সরকার! শেখ জুবাইর আল-সাবার চুরি যাওয়া মুক্তো সম্পর্কে কোনও তথ্যই আমাদের জানা নেই।

আমি চমকে উঠেছিলাম। কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে আস্তে বললেন—ঠিক এই তথ্যই আমি জানতে এসেছিলাম। পেয়ে গেলাম।

ডঃ সুন্দরম ভুরু কুঁচকে তাকালেন।—তার মানে?

কর্নেল তাঁর কথায় কান না করে বললেন—প্রসাদজি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান না। ওঁকে জানিয়ে দেবেন, আমার সঙ্গে দেখা করলে লাভবান হতেন।

—ধোঁয়াটে কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না কর্নেল সরকার।

শেখ সায়েবকে প্রসাদজি যত বোকা ভেবেছিলেন, উনি তত বোকা নন।

ডঃ সুন্দরম উঠে দাঁড়ালেন। মুখের রেখায় চাপা রাগ স্পষ্ট। —আপনার হেঁয়ালি শোনার সময় আমার নেই। আপনি আসতে পারেন। আর একটা কথা আপনাকে জানিয়ে রাখা উচিত। এই কোম্পানির সঙ্গে সরকারের এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। দুবাইয়ে কাউন্সিলের ফরেন অফিসের চার্জে আছেন প্রসাদজির জামাই।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন—প্রসাদজিকে আর একটা কথা বলে দেবেন। ইন্দ্রজিৎ রায় ওঁর ফাঁদ এড়াতে গিয়ে আরেকটা ফাঁদে পড়েছিল। প্রসাদজি যেন একই ভুল না করেন।

ডঃ সুন্দরমের সোনালি ফ্রেমের চশমা নাকের ডগায় ঝুলে ছিল। চশমার ওপর দিয়ে দুটি নিষ্পলক চোখ দেখা যাচ্ছিল। এই অবস্থায় ওঁকে রেখে আমরা বেরিয়ে এলাম।

রিসেপশন থেকে বেরিয়ে লিফটের জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় করিডরের শেষ প্রান্তে বাঁকের মুখে একজন বেঁটে গাব্দাগোব্দা চেহারার টাইস্যুট পরা ভদ্রলোককে দেখতে পেলাম। মুখে ফ্রেঞ্চকাট

কালো দাড়ি এবং মাথায় টুপি। হাতে একটা ব্রিফকেশ। ভদ্রলোক আসতে আসতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে হাত তুলে ঘড়ি দেখলেন। তারপর যেদিক থেকে আসছিলেন, সেইদিকেই হন্তদন্ত ফিরে গেলেন। মুখটা কেন যেন চেনা মনে হল।
তবে সাংবাদিক জীবনে কত প্রেস কনফারেন্স কভার করেছি। কোথাও দেখে থাকব হয়তো।
নীচের পার্কিং জোনে এসে বললাম—বড্ড জট পাকিয়ে গেল, বস্।
কর্নেল তুম্বোমুখে বললেন—সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকার একটা বিপদ হল, মানুষ তখন একচক্ষু হরিণ হয়ে ওঠে। দৃষ্টিটা তখন সামনে। আর কত এগোনো যায়, সেই চিন্তা। আসে-পাশে বা পেছনে ঘুরে কিছু দেখে না। বুঝলে তো?
গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললাম—শুধু বুঝলাম মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সি এই কেসে জড়িত কি না জানতে এসেছিলেন।
—হুঁ।
—আপনি হঠাৎ এত গম্ভীর কেন?
—গতরাতে ইস্টার্ন বাইপাসে তোমার সঙ্গে খেলাকরা লাল মারুতির শেষ দুটো সংখ্যা ৬৭ নয়, ৭৬।
একটুর জন্য একটা অ্যাম্বাসাডারের সঙ্গে ধাক্কা থেকে বেঁচে গেলাম, এমন হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকালেন। তারপর বললেন—তোমাকে বরাবর বলেছি জয়ন্ত, দক্ষ সাংবাদিক হওয়ার জন্য দরকার তীক্ষ্ন পর্যবেক্ষণ। লাল মারুতিটা ওই বাড়ির পার্কিং জোনে পার্ক করা ছিল। তা ছাড়া তুমি লক্ষ্য করোনি, পার্কিং জোনের একটা করে অংশ একএকটা কম্পানির জন্য অ্যালট করা। ফলকে কোম্পানির নাম লেখা আছে। বাইরের লোকজনের জন্য জেনারেল জোন, যেখানে তুমি গাড়ি পার্ক করেছিলে।
—সেই মারুতিটার শেষ দুটো সংখ্যা ৬৭ হতেও পারে। আপনি কী ভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন?
—অংক ডার্লিং, অংক! মহাবীর ট্রেড এজেন্সি তোমার বায়োডাটা কম্পিউটারাইজড করে রেখেছে। ডঃ সুন্দরমের কাছে তার আভাস পেয়েছ।

ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললাম—রহস্য ঘণীভূত তা হলে !

কর্নেল চুরুট জেবলে ধোঁয়ার ভেতর বললেন—হুঁ। তবে এতক্ষণে খেইটা হয়তো দেখতে পাচ্ছি।

—প্লিজ, আমাকে খেইটা দেখিয়ে দিন !

—বনানী সেন···বলে কর্নেল সিটে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে পেঁছিলে উনি চোখ খুলে সিধে হয়ে বসলেন। বললেন—বউ বাজার জয়ন্ত ! একবার চন্দ্র জুয়েলার্সের কুঞ্জনাথ-বাবুর সঙ্গে দেখা করা দরকার। ফুয়েল খরচ হবে তোমার গাড়ির। হোক না। আমি উসুল করে দেব। ভেবো না।

হাসতে হাসতে বললেন—দৈনিক সত্যসেবক দেবে ফুয়েল খরচ। কারণ পুরো স্টোরিটা পেলে কাগজের সার্কুলেশন এক লাখ বেড়ে যাবে। কাগজ নাকি ভাল হয়ে যাচ্ছে। কাগজের এজেণ্টরা রোজ এসে সার্কুলেশন ম্যানেজারের কাছে রিপ্রেজেণ্টেশন দিচ্ছে।

চন্দ্র জুয়েলার্সের বিশাল দোকান। অফিস দোতলায়। কুঞ্জনাথ আমাদের দেখে খুশিতে প্রায় নেচে উঠলেন। বললেন—একটু আগে রিং করেছিলাম স্যার! আপনার লোক বলল, আপনি বেরিয়েছেন। মেঘ না চাইতেই জল পেয়ে গেলাম।

কর্নেল বসে বললেন—কোনও নতুন খবর আছে ?

কুঞ্জনাথ উত্তেজিত ভাবে বললেন—ডিটেকটিভ ভদ্রলোক চোরডিহা থেকে কিছুক্ষণ আগে ট্রাংককল করেছিলেন। টাকা নিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু আমাকে একা যেতে হবে। উনি নাকি ফাঁদ পেতে কিডনাপারদের ধরবেন। দাদাকেও উদ্ধার করে দেবেন। এখন কথা হল, ওঁর কথায় ভরসা করে অতগুলো টাকা নিয়ে একা যাওয়া কি ঠিক হবে ? তা ছাড়া ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে।

কর্নেল বললেন—হুঁ। হালদার মশাইয়ের কিছু বাতিক আছে। আমারও কম নেই। তবে মনে রাখবেন, উনি পুলিশের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর ছিলেন। আপনি টাকা নিয়ে যেতে পারেন। তবে সঙ্গে শক্ত সমর্থ লোক নেবেন। তারা আপনার অচেনা লোক সেজে যাবে। হালদার মশাইয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়ে গেলে ওরা স্টেশনে থেকে যাবে।

কুঞ্জনাথ দ্বিধার ভাব দেখিয়ে বললেন—সঙ্গে আপনার মতো মানুষ পেলে চিন্তার কিছু ছিল না।

আমি বললাম ট্রাঙ্ককলে ডিটেকটিভ ভদ্রলোকই যে কথা বলছেন, আপনি সিওর তো কুঞ্জনাথবাবু?

কুঞ্জনাথ হকচকিয়ে গেলেন।—সেও তো ভাববার কথা। তবে ইস্টবেঙ্গলের ভাষায় কথা বললেন। কথাবার্তার ভঙ্গিতে উনি বলেই মনে হল। তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন। যদি অন্য কেউ হয়? তাই না কর্নেলসায়েব?

কর্নেল হাসলেন।—হালদারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা না হলে ফিরে আসবেন।

কুঞ্জনাথ করুণ মুখে বললেন—চোরডিহা নাম শুনেই কেমন ভয় করছে। তাতে বিহার মুলুকের যা কাণ্ডকারখানা কাগজে পড়ি—

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে বললেন—ডিসিডিডি লাহিড়ি সাহেবকে বলুন, আপনার সঙ্গে সাদা পোশাকের পুলিশগার্ড যেন থাকে।

—তা হলে যাব বলছেন?

—যান। কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন —যেজন্য এলাম, বলি। আপনি ম্যাজিক দেখতে ভালবাসেন?

কুঞ্জনাথ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

—বিশেষ করে বিশ্বখ্যাত জুনিয়ার পি সি সরকারের ম্যাজিক?

—কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন স্যার?

—আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন কুঞ্জনাথবাবু!

কুঞ্জনাথ নড়ে বসলেন।—মনে পড়েছে। মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির মানেজিং ডাইরেক্টর গণেশলাল প্রসাদ দাদাকে দুটো ম্যাজিক শোয়ের টিকিট দিয়েছিলেন। দাদা আমাকে টিকিট দিয়েছিলেন। দাদা আমাকে টিকিট দুটো দিয়ে বলেছিল, আমার সময় হবে না। তবে প্রসাদজি যখন দিয়েছেন, যাওয়া উচিত। বরং তুই যাস্ বউমাকে নিয়ে। তো স্যার, আমার স্ত্রী সেদিন হঠাৎ শ্বশুর-মশাইয়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে চলে গেল। সেদিন প্রসাদজীর অফিস থেকে একটা ট্রেডিং ইনফরমেশন দিতে এসেছিল সেই মেয়েটা স্যারব—নানী সেন। ডেটা রিসার্চ সেকশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট।

কথায়-কথায় ওকে বললাম—ম্যাজিক দেখতে চাও ?

—টিকিট দুটো ওকে দিয়েছিলেন তা হলে ?

—হ্যাঁ স্যার।

—আপনি কি দাদাকে বলেছিলেন আপনার যাওয়া হচ্ছে না ?

—না তো !

—আপনি নিজের ইচ্ছায় দিয়েছিলেন ?

—হ্যাঁ স্যার ! মেয়েটা আমাদের অনেক সিক্রেট ইনফরমেশন দেয়। ওকে আমরা খুশি রাখতে চেষ্টা করি সব সময়।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—চলি কুঞ্জনাথবাবু ! আপনি ডিসি ডিডি-র সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করে টাকা নিয়ে চোরডিহা চলে যান। দাদাকে উদ্ধার করা আপনার কর্তব্য।

রাস্তায় নেমে বললাম—ব্যাপারটা কী ?

কর্নেল গাড়িতে ঢুকে বললেন—রহস্যের খেইটা সত্যি পাওয়া গেল। কাজেই ঠিক পথে এগোচ্ছি।...

ফিরে আসার পথে ডঃ সুন্দরমকে বলা কর্নেলের কথাগুলো মনের পর্দায় ভেসে উঠছিল।

এক ঃ প্রসাদজি কর্নেলের সঙ্গে দেখা করলে লাভবান হতেন।

দুই ঃ প্রসাদজি শেখসায়েবকে যত বোকা ভেবেছিলেন, উনি তত বোকা নন।

তিন ঃ প্রসাদজির ফাঁদ এড়াতে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ অন্য ফাঁদে পড়েছিল।

এই তিনটি কথার ওপর ভিত্তি করে নিজেই রহস্যের খেই খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। মোটামুটিভাবে আঁচ করলাম, শেখসায়েব প্রথমে মুক্তোচুরির ব্যাপারে প্রসাদজির সঙ্গেই যোগাযোগ করেছিলেন। কিন্তু শেষাবধি তাঁকে যে-কোনও কারণে হোক, বিশ্বাস করতে না পেরে হরনাথের কাছে যান। হরনাথ এদেশে তাঁর মুক্তোর বড় খদ্দের। কাজেই হরনাথকেই বেছে নেওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। ওদিকে প্রসাদজি মুক্তোর লোভে ইন্দ্রজিৎকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফাঁদটা কী ?

মহাজাতি সদনে ম্যাজিক শোয়ের দুটো টিকিট ?

প্রসাদজি কি ইন্দ্রজিৎকে কিডন্যাপের চক্রান্ত করেছিলেন মহাজাতি

সদনের কাছে? মুক্তো আদায় করার জন্য পীড়ন করতেন। তা হলে টিকিটদুটো সরাসরি ইন্দ্রজিতের প্রেমিক বনানীকে দিলেন না কেন? কুঞ্জনাথের কথায় জানা গেল, টিকিটদুটো তিনি হরনাথকে দিয়েছিলেন।

কেন?

এর একটাই জবাব হতে পারে। মুক্তো ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে হাতাতে প্রথমে হরনাথ এবং প্রসাদজি গোপনে একটা বোঝাপড়ায় এসেছিলেন। ইন্দ্রজিৎ ম্যাজিক শোয়ের ফাঁদ এড়াতে গিয়ে দৈবাৎ আমাকে পেয়ে গিয়েছিল। পরের ফাঁদটা হরনাথের।

সেই ফাঁদ প্রসাদজির অজ্ঞাতসারে আগেই পেতে রেখেছিলেন হরনাথ। পরমেশের বাগানে আমার কুড়িয়ে পাওয়া চিঠিটা থেকে এটা বোঝা যায়। হরনাথ প্রসাদজিকে ফাঁকি দিয়ে একা মুক্তো হাতানোর চক্রান্ত করেন। এরপর প্রসাদজি খাপ্পা হয়ে হরনাথকে কিডন্যাপ করেছেন। কিন্তু প্রসাদজি কর্নেলের সঙ্গে দেখা করলে কী লাভ হত?

—জয়ন্ত! সাবধান! অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলবে।

একটা আবর্জনাবোঝাই বিশাল ট্রাক ওভারটেক করে বেরিয়ে গেল। স্টিয়ারিং শক্ত হাতে ধরে বললাম—নাহ্। আমি ব্যাকভিউ মিররে লক্ষ্য রেখেছিলাম। জানতাম ব্যাটাছেলে ওভারটেক করবে।

—কিন্তু তুমি লক্ষ্য করোনি সেই লাল মারুতি আমাদের সারাক্ষণ ফলো করছে। চমকে উঠে বললাম—কি? কোথায়?

—ওয়েলিংটন স্কোয়ারের আগে গণেশ অ্যাভিনিউ দিয়ে রাইট টার্ন করে চলে গেছে।

—আপনার বলা উচিত ছিল। ওকে তাড়া করতাম।

কর্নেল হাসলেন—কলকাতা শহরে কোনও গাড়িকে ফলো করা যদি বা যায়, তাড়া করে ধরা যায় না। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। হালদার মশাইয়ের মতো তা হলে রাস্তা দিয়ে দৌড়তে হয়। তবে উনি একসময় পুলিশ ছিলেন। চোরডাকাতের পিছনে দৌড়ুনো অভ্যাস আছে। তোমার নেই।

—প্রথমে কোথায় দেখেছিলেন লালটু হারামজাদাকে?

কর্নেল এবার অট্টহাসি হাসলেন।—ঠিক বলেছ। লালটু হারামজাদাই বটে। চন্দ্র জুয়েলার্স থেকে বেরিয়ে অনেকটা দূরে চোখ পড়েছিল। কিন্তু অকারণ রাস্তাঘাটে সিন ক্রিয়েট করার মানে হয় না। তা ছাড়া রিস্কও ছিল। গাড়ির জটলা থেকে গুলি ছুঁড়তে পারত। কোন গাড়ি থেকে কে গুলি ছুঁড়ল, তা বলার জন্য তুমি বা আমি বেঁচে থাকতাম না।

আঁতকে উঠলাম।—গুলি ছোঁড়ার কথা ভাবছেন কেন?

—জাস্ট্ একটা কথার কথা।

—নাহ্! আপনি সিরিয়াসলি বলছেন মনে হল।

—কর্নেল আস্তে বললেন—ছেড়ে দাও!

—ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না বস্! ডি সি ডি ডি লাহিড়িসায়েবকে গাড়িটার নাম্বার জানিয়ে দিন।

কর্নেল আবার বললেন—ছেড়ে দাও!

—আমি কিন্তু জানিয়ে দেব।

—না ডার্লিং! তাতে কোনও লাভ হবে না। আমার ধারণা, গাড়িটার নাম্বার প্লেটে ভুয়ো নাম্বার লাগানো আছে। বেগতিক দেখলে নাম্বার প্লেট বদলে ফেলবে। এ শহরে অসংখ্য লাল মারুতি আছে।

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের বাড়ির কাছে এসে বললাম—দুটো বাজে প্রায়। আপনাকে এখানেই নামিয়ে দিচ্ছি।

কর্নেল ষড়যন্ত্রসংকুল স্বরে বললেন—তোমার লাঞ্চের নেমন্তন্ন।

কথার ভঙ্গিতে হেসে বললাম।—এবার দেখছি আমাকে পাকাপাকি ভাবে আপনার অ্যাপার্টমেন্টেই ডেরা পাততে হবে। সল্ট লেকের ফ্ল্যাটে বরং ভাড়াটে বসিয়ে দেব।

—আমার আপত্তি নেই। তবে তুমিই বেশিদিন টিকতে পারবে না। পাগল হয়ে যাবে। প্রতিদিন রাজ্যের যত অদ্ভুত-অদ্ভুত লোক এসে আমাকে উত্যক্ত করে। ষষ্ঠী বলে, আমার পাল্লায় পড়ে সে নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছে। কথাটা সত্যি।

গাড়ি লনের পার্কিং জোনে রেখে কর্নেলের সঙ্গ ধরলাম। তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে ডোরবেলের সুইচ টেপার আগেই ষষ্ঠীচরণ দরজা

খুলে দিল। নিশ্চয় জানালা দিয়ে আমাদের দেখতে পেয়েছিল।
ড্রয়িং রুমে ঢুকে কর্নেল বললেন—জয়ন্ত খাবে। শিগগির খেতে দে।

ষষ্ঠী বলল—দাদাবাবু খাবেন সে কি আমি জানি না ?

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন—তা হলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ?

—আজ্ঞে বাবামশাই, একটা ফোং এসেছিল। আমি বললাম, বাবামশাই বেইরেছেন। কখন ফিরবেন বলতে পারব না।

—নাম জিজ্ঞেস করেছিলি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বললে, পরে ফোং করব। কথা শুনে মনে হল বাঙালি না।

ষষ্ঠী চলে গেলে কর্নেল বললেন—এক মিনিট ডার্লিং! পোশাক বদলানো দরকার। তুমি বরং বাথরুমে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে ফেলো। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে ডাইনিংয়ে খাওয়ার টেবিলে বসে ডঃ সুন্দরমকে বলা কর্নেলের কথা থেকে তৈরি আমার থিওরিটা উত্থাপন করলাম।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—তোমাকে বরাবর বলেছি জয়ন্ত, খাওয়ার সময় কথা বলা উচিত নয়। প্রথমত, খাওয়ার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হবে। দ্বিতীয়ত, খাবার গলায় আটকে যাওয়ার চান্স আছে।

তা-ই বটে! আমার বৃদ্ধ বন্ধুর এই অভ্যাস আছে। খাওয়ার সময় উনি কথা বলা পছন্দ করেন না।

কিন্তু এই সময় ফোন বেজে উঠল। ষষ্ঠী ড্রয়িং রুমে চলে গেল ফোন ধরতে। একটু হেসে বললাম—মনে হচ্ছে, আপনার এই অভ্যাসটা সবসময় মেনে চলতে পারেন না। ধরুন, ফোনটা যদি ডি সি ডি ডি লাহিড়ি সায়েবের হয় ? কিংবা হালদার মশাইয়ের ট্রাঙ্ককল ?

কর্নেল হাসলেন।—ব্যতিক্রম নিয়মকেই সাব্যস্ত করে ডার্লিং! তবে ফোনটা প্রসাদজির হওয়াই সম্ভব।

ষষ্ঠী এসে বলল—সেই ভদ্রলোক বাবামশাই। বললাম, উনি এখন খাচ্ছেন। শুনে বললেন, পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।

সায়েব যেন থাকেন।

কর্নেল চুপচাপ খাওয়া শেষ করলেন। আমি মনে মনে উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। যদি সত্যি মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর গণেশলাল প্রসাদ কর্নেলের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, আমার থিওরি বাজিয়ে নেওয়ার চান্স ছাড়ব না।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন কর্নেল। চুরুট জেবলে বললেন—তোমার থিওরিটা মন্দ না। তবে একখানে একটু ফাঁক থেকে গেছে।

—কোথায় বলুন তো?

—ম্যাজিক শোয়ের টিকিট হরনাথ তাঁর ভাই কুঞ্জনাথকে দিয়েছিলেন। কুঞ্জনাথ দেন বনানীকে। নেহাত একটা আকস্মিক যোগাযোগ এসে যাচ্ছে তোমার থিওরিতে।

—ধরুন, প্রসাদজি বা হরনাথ বনানীকে টিকিট দেওয়ার পর ইন্দ্রজিৎ কিডন্যাপড হলে দুজনে জড়িয়ে পড়তেন। বনানী পুলিশকে বলত কে তাকে টিকিট দিয়েছিল।

কর্নেল একরাশ ধোঁয়ার ভেতর বললেন—একই ব্যাপার। তোমার থিওরি অনুসারে বনানী কুঞ্জনাথের নাম করত। পুলিশের জেরার চোটে কুঞ্জনাথ বলতে বাধ্য হতেন কে তাঁকে টিকিট দিয়েছিল।

হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম—নাহ্। কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে আপনি বলছেন রহস্যের খেই পেয়ে গেছেন। ঠিক পথেই এগোচ্ছেন।

—হ্যাঁ। খেই পেয়ে গেছি এবং সঠিক পথেই এগোচ্ছি।

—খেইটা কী?

—ইন্দ্রজিতের চুরি করে আনা মুক্তো কোনও পক্ষই হাতাতে পারেনি। ইন্দ্রজিৎ তা যেখানে বা যার কাছে রেখেছিল, সেখানে বা তার কাছেই আছে। তা না হলে এতসব ঘটনা ঘটত না।

একটু ভেবে নিয়ে বললাম—বনানীর কাছে নেই তো?

—কর্নেল হাসলেন। তুমি ওর সঙ্গে ভাব জমিয়ে দেখতে পারো।

হঠাৎ বনানীর একটা কথা মনে পড়ে গেল। বললাম—কর্নেল! বনানী একটা মিথ্যা কথা বলেছে আপনাকে। ডাহা মিথ্যা।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে তাকালেন।—মিথ্যাটা কী?

বললাম—বনানী বলছিল জুয়েলার হরনাথ চন্দ্রকে সে চেনে না। অথচ কুঞ্জনাথের কাছে জানা গেল, সে গোপনে ট্রেড সিক্রেট পাচার করতে নিয়মিত চন্দ্র জুয়েলার্সে যেত। কুঞ্জনাথ তাকে ম্যাজিক শোয়ের টিকিট দিয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন—বনানী গোপনে ট্রেড সিক্রেট চন্দ্র জুয়েলার্সকে পাচার করত বলেই আমাকে কথাটা লুকিয়েছে। এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। যাই হোক—কর্নেল মিটিমিটি হাসলেন।—তুমি সাংবাদিক। বোম্বেতে ইন্দ্রজিৎকে ইণ্টারভিউ করেছিলে। কাজেই তুমি সহজে ওর সঙ্গে ভাব জমাতে পারো।

হাসতে হাসতে বললাম—ওই যে শাস্ত্রবাক্য আছে, মেয়েদের মনের নাগাল দেবতারাও পান না।

এতক্ষণে প্রত্যাশিত ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁকলেন—ষষ্ঠী! ষষ্ঠীর সাড়া এল কিচেনের দিক থেকে।—এঁটো হাত বাবামশাই! এঁটো হাতে দরজা না খোলা ষষ্ঠীচরণের একটা সংস্কার। কাজেই আমিই দরজা খুলতে গেলাম। তাগড়াই চেহারার এক গুফো মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তুম্বো মুখে ইংরেজিতে বললেন—কর্নেল সরকারের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে।

—আপনি কি মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির···

আমার কথার ওপর ভদ্রলোক বললেন—কেউ কি মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সি থেকে কর্নেল সরকারের সঙ্গে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করেছে?

একটু ভড়কে গেলাম কথার ভঙ্গিতে। বললাম—না। কেউ বলেনি। অনুমান করছি আর কী!

—আপনি সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী?

অমনি স্মার্ট হয়ে বললাম—তা হলে আপনি মিঃ গণেশলাল প্রসাদ?

ভেতর থেকে কর্নেল ডাকলেন।—ওঁকে নিয়ে এস জয়ন্ত।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে ভদ্রলোক নমস্কার করে বসলেন। তারপর আমাকে হতাশ করে একটু হেসে বললেন—আমার নাম যোগীন্দ্র শর্মা। প্রসাদজি আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি ওঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। বিকেলের ফ্লাইটে উনি জরুরি কাজে বোম্বে চলে যাচ্ছেন। তা না

হলে নিজেই আসতেন।
—বলুন মিঃ শর্মা, প্রসাদজির জন্য কী করতে পারি?
—প্রসাদজি দুঃখিত। ডঃ সুন্দরম আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন।
—শুধু দুঃখপ্রকাশের জন্য প্রসাদজি নিশ্চয় আপনাকে পাঠাননি?
যোগীন্দ্র শর্মা আস্তে বললেন—উনি দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। তবে উনি আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন আপনি কী ব্যাপারে ওঁকে সাহায্য করতে আগ্রহী?
—বুঝলাম না।
—আপনি ডঃ সুন্দরমকে বলে এসেছেন, প্রসাদজি আপনার সঙ্গে দেখা করলে লাভবান হতেন। এ কথার অর্থ উনি বুঝতে পারেননি।
কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট জেবলে ভীষণ গম্ভীর মুখে বললেন—দুঃখিত মিঃ শর্মা। তা জানতে হলে প্রসাদজিকে আমার মুখোমুখি হতে হবে। এ ভাবে 'ভায়া মিডিয়া' কথা বলা আমি পছন্দ করি না। আপনি আসতে পারেন। আমি ব্যস্ত আছি।
যোগীন্দ্র শর্মা কর্নেলের দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর সটান বেরিয়ে গেলেন। আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম। কর্নেল চুরুট অ্যাসট্রেতে রেখে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন…

ছয়

দুপুরে খাওয়ার পর সুযোগ পেলেই একটুখানি গড়িয়ে নেওয়া আমার অভ্যাস। পুরনো বাংলাটামে' একে বলা হয় 'ভাতঘুম'। সাংবাদিক জীবনে অফিসে সভাসম্মেলনে, এমন কি বিধানসভার চেয়ারে হেলান দিয়ে অনেককে নাক ডাকাতে দেখেছি। এই তো কিছুদিন আগে এক মন্ত্রীমশাইয়ের চেয়ারে শরীর এলিয়ে ঘুমুনোর ছবি আমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার প্রথম পাতায় বেরিয়েছিল। আমি কোন ছার।

ষষ্ঠীর ডাকে ভাতঘুম ভেঙে গিয়েছিল। ঘরের ভেতর আবছা আঁধার। সোফা থেকে ধুড়মুড় করে উঠে বসলাম। ষষ্ঠী কফির পেয়ালা রেখে সুইচ টিপে বাতি জ্বালাল। তারপর মুচকি হেসে বলল—বাবামশাই আপনার ঘুম ভাঙাতে বারণ করেছিলেন। নিন। গরম-গরম কোফি' খেয়ে বেরেন চাঙ্গা করুন।

বললাম—তোমার বাবামশাই কোথায় ?

—বেইরেছেন। বলে গেছেন সাড়ে ছটার মধ্যেই ফিরবেন। আপনাকে অপিক্ষে করতে বলেছেন। যেতে যেতে ষষ্ঠীচরণ পিছু ফিরল। ফের বলল—যেন চলে যাবেন না দাদাবাবু! তাহলে বাবামশাই আমাকে বকাবকি করবেন।

দেয়ালঘড়িতে ছটা বাজে। কফি খেতে খেতে সত্যি 'বেরেন' চাঙ্গা হচ্ছিল। মনে পড়ে গেল, কর্নেল প্রসাদজির পি এ যোগীন্দ্র শর্মাকে তখন যেন অপমান করেই তাড়িয়ে দিলেন। কর্নেলের স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে এটা মানায় না। ভদ্রলোক কর্নেলকে অপমান-জনক কোনও কথা তো বলেননি। চাকরির দায়ে মালিকের হুকুম পালন করতেই এসেছিলেন। তা হলে তাঁকে অমন করে ভাগিয়ে দিলেন কেন ?

প্রায় মিনিট পনের পরে টেলিফোন বাজল। ওপাশের ঘর থেকে ষষ্ঠী বলল—ফোংটা ধরুন দাদাবাবু।

ফোন তুলে সাড়া দিয়েই কর্নেলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম—ডার্লিং! আশাকরি ক্লান্তি দূর করার মতো একখানা ঘুম ঘুমিয়ে নিয়েছ। হ্যাঁ, এটা তোমার দরকার ছিল। কফি খাওয়াও শেষ হয়েছে। ব্রেনও চাঙ্গা।

—আপনি দিব্যদ্রষ্টা। সবই দেখতে পাচ্ছেন।

—হিসেব জয়ন্ত, হিসেব! আমি জানতাম তুমি একখানা লম্বা ঘুমই দেবে। তাই ষষ্ঠীকে বলে এসেছিলাম ঠিক ছটায় তোমাকে জাগিয়ে দিতে এবং···

—ব্যাখ্যার দরকার নেই। আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন ?

—হাওড়া স্টেশন থেকে।

—সে কী! ওখানে কী করছেন ?

—ফিরে গিয়ে বলব'খন। তোমাকে রিং করার কারণ, হাওড়া স্টেশন এমন একটা জায়গা, যেখান থেকে বাড়ি ফিরতে কতক্ষণ সময় লাগবে বলা কঠিন। প্রচণ্ড জ্যাম দেখে এসেছি। এখন জ্যামটা আরও বেশি হওয়াই সম্ভব। কাজেই কথামতো সাড়ে ছটায় ফিরতে পারছি না। যতক্ষণ না ফিরি, তুমি যেন এ বৃদ্ধের ওপর খাপ্পা হয়ে চলে যেও না। তাছাড়া ডার্লিং, সেই লাল মারুতির খপ্পরে পড়তে পারো। সাবধান। লাল জুজু।

কথার ভঙ্গিতে হাসি পেল। বললাম—লাল জুজুর নয়। প্রায় আপনার খাতিরে আমি অপেক্ষা করব।

—আর একটা কথা। আমার কাছে কেউ গেলে তাকে শুধু বলবে, আমি বেরিয়েছি। ফিরতে দেরি হতে পারে। তবু যদি সে অপেক্ষা করতে চায়, বসিয়ে রাখবে। আপ্যায়নের যেন ত্রুটি না হয়।

—সে যদি সেই যোগীন্দ্র শর্মা হয়?

—হোক্ না।

ফোন ছেড়ে দিয়ে সিগারেট ধরালাম। টেবিল থেকে 'নেচার' পত্রিকা তুলে নিলাম। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বোধগম্য কোনও নিবন্ধ খুঁজছিলাম। পেলামই না। এক সময় ষষ্ঠী পর্দার ফাঁকে মুখ গলিয়ে জানতে চাইল আর 'কোফি' খাব কি না। খাব না শুনে তার মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

বরাবর লক্ষ্য করেছি, কারও জন্য প্রতীক্ষায় থাকার সময়টা বড্ড বিরক্তিকর। সেকেণ্ডগুলো অসম্ভব দীর্ঘ হয়ে যায়। পৌনে সাতটায় ডোরবেল বাজল। কর্নেল ভেবেই ষষ্ঠী যাওয়ার আগে হন্তদন্ত উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

কর্নেল নন। একজন রোগা চেহারার বয়স্ক ভদ্রলোক। উস্কোখুস্কো চেহারা। মুখে ক্লান্তির গাঢ় ছাপ। আস্তে বললেন—আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

বললাম—কর্নেল সরকার একটু বেরিয়েছেন। ফিরতে দেরি হতে পারে।

—কিন্তু আমার যে খুবই জরুরি দরকার। ক'দিন থেকে

টেলিফোনটা খারাপ। তাই ফোনে যে যোগাযোগ করব, তার উপায় নেই। তা ছাড়া ব্যাপারটাও কনফিডেনশিয়্যাল। তাই শেষ পর্যন্ত কষ্ট করে আসতে হল।

—আপনি কোথায় থাকেন?

—বাগবাজার এরিয়ায়। এই আমার নেমকার্ড।

নেমকার্ডে লেখা আছে জে কে সেন। তার পাশে কোনও ডিগ্রির সাংকেতিক পরিচয়। নীচে বোল্ড টাইপে ছাপা: 'মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার'। ব্র্যাকেটে রিটায়ার্ড। অমনি বনানীর কথা মাথায় ভেসে এল। দ্রুত বললাম—বনানীর কোনও বিপদ হয়নি তো?

উনি চমকে উঠলেন।—আপনি বনানীকে চেনেন?

—চিনি। মানে, বনানী কর্নেলের কাছে এসেছিলেন। আপনি ভেতরে আসুন।

—আমি বনানীর বাবা। বলে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কর্নেলের ড্রয়িং রুমে এলেন। সোফায় বসে শাদা অবিন্যস্ত চুলে হাত বুলিয়ে ক্লান্তভাবে বললেন—আপনি কি কর্নেল সায়েবের ছেলে?

—না। আমার নাম জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।

বনানীর বাবা নমস্কার করে বললেন—আমার সৌভাগ্য। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। নিউজপেপারে এটা ফ্লাশ হওয়া দরকার। আজকাল পুলিশকে দিয়ে কিছু করানো কঠিন। নিউজপেপারে লিখলে অথরিটির যদি টনক নড়ে, একটা আসকারা হওয়ার চান্স থাকে।

উত্তেজনা চেপে বললাম—আপনি ব্যাপারটা খুলে বললে নিশ্চয় কাগজে ফ্লাশ করব।

বনানীর বাবা শ্বাস-প্রশ্বাসে মিশিয়ে বললেন, কিছুদিন থেকে কয়েকটা উড়োচিঠি পাচ্ছিলাম। তত গ্রাহ্য করিনি। বাড়িতে অবিবাহিতা মেয়ে থাকলে এধরনের চিঠি আজকাল আসে। আমার পাশের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোকও পাড়ার মস্তানদের উড়ো চিঠির পাল্লায় পড়েছিলেন। শেষে মেয়ের বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আমার মেয়ে—একমাত্র মেয়ে, মোটামুটি ভাল

একটা চাকরি করে এবং আমার স্ত্রী বেঁচে নেই কাজেই ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তো আমি যেতে পারি না।
—উড়ো চিঠিতে কী লেখা থাকে ?
—সব চিঠিতে একই কথা। হারামজাদারা নীচের লেটারবক্সে ফেলে যায়। আপনাকে দেখাচ্ছি।
ভদ্রলোক বুকপকেট থেকে একটা খাম বের করে আমাকে দিলেন। খামটা মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির। খামটা নিশ্চয় বনানীর কাছ থেকে নিয়েছেন। খানপাঁচেক চিরকুট বেরুল ভেতর থেকে। লাল ডটপেনে লেখা একটিমাত্র বাক্য ঃ
যতীনবাবু, বনানীকে বলবেন, আমার সঙ্গে যেন শিগগির দেখা করে।
একই হাতের লেখা। চিরকুটগুলো খামে ভরে বললাম—বনানীকে আপনি এগুলো দেখিয়েছেন ?
—নাহ্। দেখানো উচিত মনে করিনি। আসলে ও একটু জেদি আর সাহসী টাইপ মেয়ে। এ নিয়ে হইচই করবে, লোকেরা জেনে যাবে—এও একটা আশঙ্কার কারণ ছিল। আবার এও ভেবেছিলাম —বলতে—তো এই সামানা ব্যাপারে আপনি কর্নেলের কাছে ছুটে এসেছেন কেন ? কাগজেই বা কী ফ্ল্যাশ করতে চাইছেন।
যতীনবাবু এতক্ষণে উত্তেজিতভাবে সোজা হয়ে বসলেন—না। শুধু চিঠির ব্যাপারটা নিয়ে আমার ছুটে আসার কারণ ছিল না। আজ বিকেলে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। ফেরার সময় মোড়ে রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ একটা গাড়ি আমার পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে একটা লোক বেরিয়ে চাপা গলায় আমাকে বলল, 'যতীনবাবু আপনার মেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করছে না কেন ? বাড়ি ফিরেই বলবেন আজ রাত ন'টার মধ্যেই যেন দেখা করে। বলে দেবেন, এটা আলটিম্যাটাম'।
তারপর ?
—আমি তো হকচাকিয়ে গেছি। কিছু বলার আগেই লোকটা গাড়িতে ঢুকে পড়ল। তারপর গাড়িটা জোরে বেরিয়ে গেল। বাড়ি ফিরে বনানীর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বনানীর ফিরতে

দেরি হয়। কোনও দিন বেশি দেরি হলে ফোন করে জানিয়ে দেয়। তো আমার ফোনটা খারাপ। পাশের ফ্ল্যাটে অমরবাবুর ফোনটা ঠিক আছে। অমরবাবুর স্ত্রী এসে জানিয়ে যান আজ ওর ফিরতে দেরি হবে। ওঁদের ফ্ল্যাটে গিয়ে বনানীর অফিসে রিং করলাম। তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে। বনানীর সাড়া পেয়ে ওকে শিগগির বাড়ি ফিরতে বললাম। ও বলল, ফিরতে দেরি হবে। অগত্যা ফোনে ওকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা জানিয়ে দিলাম। তখন ও কর্নেল সায়েবের ঠিকানা দিয়ে আমাকে শিগগির গিয়ে দেখা করতে বলল। আমি বললাম, আজ যত দেরি হোক ওয়েট করবি। আমি গিয়ে তোকে নিয়ে আসব।

চুপচাপ শোনার পর বললাম—গাড়িটার নাম্বার দেখেছিলেন ?

—না। ওই যে বললাম আমি ভীষণ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। তবে গাড়িটা লাল রঙের একটা মারুতি।

চমকে উঠলাম।—লাল মারুতি ?

—হ্যাঁ। লাল মারুতি।

—লোকটার চেহারা কেমন ?

—বেঁটেমতো। মুখে দাড়ি আছে। বাধ্য হচ্ছি, বনানী কারও সঙ্গে হয় তো প্রমোশনাল সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল। তারপর সম্পর্কটা ছিন্ন করেছে। তাই হয়তো সেই ছেলেটি ব্যাপারটা আমার কানে তোলার চেষ্টা করছে।

চোখে কালো চশমা। বয়স আন্দাজ করা কঠিন। তবে গলার স্বরে মনে হল ইয়ং নয়।

আমার মনে পড়ে গেল মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির করিডোরে দেখা ঠিক এই রকম চেহারার লোকটার কথা। নীচের পার্কিং জোনে তার গাড়িটাই তা হলে পার্ক করা ছিল। কে সে ?

যতীনবাবুর জন্য ষষ্ঠীকে কফি আনতে বললাম। তারপর যতীনবাবুকে বললাম—আপনি আপনার অফিসে রিং করে দেখুন তো উনি আছেন কি না।

যতীনবাবু ব্যস্তভাবে উঠে গিয়ে ডায়াল করলেন। তারপর সাড়া পেয়ে ইংরেজিতে বললেন—বনানী, সেনকে দেবেন প্লিজ ? আমি

ওর বাবা জে কে সেন বলছি।······বেরিয়ে গেছে?······কতক্ষণ আগে?······আচ্ছা, ধন্যবাদ।

ফোন রেখে যতীনবাবু বিষণ্ণ ভঙ্গিতে বললেন—বনানী মিনিট পাঁচেক আগে অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে। খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। ওকে বলেছিলাম, কর্নেল সায়েবের সঙ্গে দেখা করে ওর অফিসে যাব। অদ্ভুত মেয়ে তো।

—আচ্ছা যতীনবাবু, আপনি ইন্দ্রজিৎ রায় নামে কাকেও চেনেন?

—ইন্দ্রজিৎ রায়? যতীনবাবু ভুরু কুঁচকে স্মরণ করার চেষ্টা করছিলেন। একটু পরে বললেন—নামটা শুনেছি মনে হচ্ছে। কে সে?

—কালকের কাগজে তার খবর বেরিয়েছিল।

—কী খবর বলুন তো?

—স্যুইসাইড করার খবর।

যতীনবাবু শ্বাস ফেলে বললেন—কিছুদিন থেকে খুঁটিয়ে খবর পড়া হয় না। উড়ো চিঠির ঝামেলায় অস্থির ছিলাম। তা ইন্দ্রজিৎ রায়ের কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন জানতে পারি?

—আপনার মেয়ে তাকে চেনেন।

যতীনবাবু একটু অবাক হলেন।—আই সি! একজন ভদ্রলোক বনানীর সঙ্গে কিছুদিন আগে দেখা করতে গিয়েছিলেন মনে পড়ছে। বনানীর অফিসের কাজেই গিয়েছিলেন। তিনিই স্যুইসাইড করেছেন না কি? এখানে কালকের কাগজ আছে? খবরটা পড়া উচিত। বলে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে স্বগতোক্তি করলেন—হ্যাঁ, ইন্দ্রজিৎ রায়। মনে পড়েছে এবার।

ষষ্ঠী কফির ট্রে রেখে গেল। বললাম—আগে কফি খেয়ে নিন। আমি কাগজটা খুঁজে দেখি।

কাগজটা খুঁজে পেলাম না। সম্ভবত কর্নেল ওটা কোথায় রেখে দিয়েছেন। যতীনবাবু কফি খাওয়ার পর বললেন—একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। বনানী কেন কর্নেলসায়েবের কাছে এসেছিল? আর কর্নেল সায়েবের কাছে আমাকেই বা পাঠাল কেন? কর্নেল-সায়েবের সঙ্গে কি মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির কোনও সম্পর্ক আছে?

বড্ড মিসটিরিয়াস ব্যাপার। বনানী কী যে করে আমি বুঝিনা।

একটু হেসে বললাম—অপেক্ষা করুন। উনি এলেই সব জানতে পারবেন।

কর্নেল এলেন প্রায় আধঘণ্টা পরে। কিন্তু ওঁর সঙ্গে যে এল, তাকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। যতীনবাবুও অবাক হয়ে বললেন—বনি! তোর অফিসে ফোন করেছিলাম।

বনানী গম্ভীর মুখে বলল—কর্নেলসায়েবের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। আলাপ করিয়ে দিই, ইনিই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

যতীনবাবু আড়ষ্টভাবে নমস্কার করলেন। কর্নেল হাঁকলেন—ষষ্ঠী! শিগগির কফি। তারপর ইজিচেয়ারে বসে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—হাওড়া স্টেশনে কুঞ্জবাবুদের সি অফ করতে গিয়েছিলাম। অনেক সাধাসাধি করে একটা শেয়ারের ট্যাক্সিতে এসপ্ল্যানেড—তারপর সোজা বনানীদের অফিসে। বনানী কাজের ছলে আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল। তারপর ওকে নিয়ে মিমদের বাড়ি গেলাম। গিয়ে শুনি, আজ সন্ধ্যাতেও ওদের বাড়িতে চোর ঢুকেছিল। তাড়া খেয়ে পালিয়ে গেছে। পর-পর-দুদিন সন্ধ্যায় একই বাড়িতে চোর ঢোকাটা ভারী অদ্ভুত।

পরমেশবাবুর বাড়িতে পর-পর দুদিন ঠিক সন্ধ্যাবেলায় চোর ঢোকা নিশ্চয় অদ্ভুত। কিন্তু তার চেয়ে অদ্ভুত বনানীর বাবাকে লেখা উড়োচিঠি এবং সেই লাল মারুতির উপদ্রব। খামসমেত চিঠিগুলো কর্নেলকে দিলাম। কর্নেল চিঠিগুলো দেখার পর বনানীকে বললেন—দেখ তো, হাতের লেখা চেনা মনে হচ্ছে না কি?

বনানী চিঠিগুলোয় দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলল—নাহ্। কিন্তু এগুলোর কথা আমাকে বাবার বলা উচিত ছিল।

যতীনবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—তোকে তখন ফোনে বললাম তো! আমি ভেবেছিলাম পাড়ার কোনও মস্তান আমার থ্রু দিয়ে তোকে টিজ করছে। বলে পুরো ঘটনাটি তিনি সবিস্তারে কর্নেলকে শোনালেন।

বনানী কর্নেলের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। কর্নেল বললেন—তুমি তখন সঠিক প্রশ্নই তুলেছিলে। তোমার বাবাকে

লোকটা প্রকারান্তরে হুমকি দিচ্ছে। উনি যেন ভয় পেয়ে তোমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে পীড়াপীড়ি করেন।

বনানী রুষ্টভঙ্গিতে বলল—তার জানা উচিত বাবা আমাকে কোনও ব্যাপারে বাধ্য করতে পারেন না।

—স্বীকার করছি পারেন না। কর্নেল একটু হেসে বললেন ফের —কিন্তু সে ভেবেছিল, প্রথম চিঠিটা পেয়েই তোমার বাবা তোমাকে দেখাবেন। তুমি বিব্রত বোধ করবে। যে লোকটা তোমার অফিসে টেলিফোনে প্রায়ই দেখা করতে বলেছে, অথচ তুমি তার কথা গ্রাহ্য করোনি, সে তখন তোমার বাবাকে উড়োচিঠি লিখতে শুরু করেছে। তাতেও কাজ হল না দেখে তোমার বাবাকে আজ মুখোমুখি হুমকি দিয়ে গেছে। বনানী, এই হুমকির একটাই অর্থ হয়।

যতীনবাবু শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন—লোকটা বলল, 'ওকে বলে দেবেন, এটা আলটিম্যাটাম।'

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। আলটিম্যাটাম। চরম হুমকি। তার মানে, আজ রাত নটার মধ্যেই তার সঙ্গে বনানী দেখা না করলে সে সাংঘাতিক কিছু করবে। বনানী, আমি আশঙ্কা করছি, তোমার বাবা বিপন্ন।

বনানী চমকে উঠল। যতীনবাবু নিষ্পলক চোখে পাথরের মূর্তির মতো তাকিয়ে রইলেন। আমি এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলাম। এবার বললাম—কর্নেল! আপনি পুলিশকে বললেই তো লাল মারুতির মালিককে মোটর ভেহিকল্‌স্ ডিপার্ট থেকে খুঁজে বের করতে পারবে।

কর্নেল বললেন—পুলিশ খোঁজ নিয়েছে। নাম্বারটা ভুয়া। তোমার এবং আমার দেখা নম্বরের লাল মারুতির মালিক নামী একজন প্রাক্তন ফুটবল প্লেয়ার। এখন কোচ হিসেবে কাজ করেন। নামটা তুমি শুনে থাকবে। বিশ্বনাথ ব্যানার্জি। ফুটবল অন্ত প্রাণ যাকে বলে। তাঁর সম্পর্কে পুলিশের কোনও খারাপ রেকর্ড নেই। বাই দা বাই, যতীনবাবু কি লাল মারুতিটার নাম্বার লক্ষ্য করেছিলেন?

যতীনবাবু বললেন—না। আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

গাড়ির নাম্বারের দিকে তাকানোর মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। কিন্তু আমি বিপন্ন বলছেন কেন কর্নেলসায়েব? আমি তো জীবনে কারও কোনও ক্ষতি করিনি। তা ছাড়া এ-ও বুঝতে পারছি না, বনিকেই বা ওই লোকটা ওভাবে দেখা করতে বলবে কেন? বনিকে সে অফিসে গিয়ে কিংবা আমার বাড়িতে নিজেই দেখা করতে পারে। রাস্তাঘাটেও দেখা করতে পারে।

ষষ্ঠী কফি আনল। কর্নেল কফিতে মন দিলেন। বনানী হাত নেড়ে ষষ্ঠীকে জানিয়ে ছিল সে কফি খাবে না। আমি বললাম—যতীনবাবু। দেখা করতে বলার নিশ্চয় কোনও অন্য মানে আছে। দেখা করাটা নিছক দেখা করা নয়। সেটা যে কী, সম্ভবত বনানীই জানেন।

যতীনবাবু তাঁর মেয়ের দিকে তাকালেন। বনানী মুখ নামিয়ে রইল। কর্নেল মুচকি হেসে বললেন—তোমাকে গোয়েন্দা হালদার মশাইয়ের চেলা হতে বলেছিলাম জয়ন্ত! তুমি ওঁর সঙ্গী হলেই পারতে। সাংবাদিকরা অনেকসময় গোয়েন্দারীতিতে কাজ করে বটে, তবে তার স্থানকালপাত্র আছে।

কর্নেলের কথায় একটু ভড়কে গিয়ে বললাম—আমি কোথায় গোয়েন্দাগিরি করলাম? নেহাত একটা ধারণা মাথায় এল।

কর্নেল যতীনবাবুর দিকে ঘুরে বললেন—আপনাকে বিপন্ন বলেছি। এ জন্য আপনার ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বনানী যদি লোকটার কথামতো আজ রাত নটায় তার সঙ্গে দেখা করে, তা হলে আর আপনি বিপন্ন থাকছেন না।

যতীনবাবু নার্ভাস মুখে বললেন— তার সঙ্গে কোথায় বনিকে দেখা করতে হবে তা তো আমাকে বলেনি সে। বনিকে সে টেলিফোন করেছিল বললেন। টেলিফোনে কি বলেছিল কোথায় দেখা করতে হবে?

—মেট্রো সিনেমার সামনে। এবং সময়ও রাত নটা।

যতীনবাবু মেয়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন—বনিকে আপনি দেখা করতে বলেছেন?

—বলেছি। এখনও বলছি। কিন্তু একটা সমস্যা আছে। বনানীর

দেখা করতে যাওয়াটা আপনার ওপর নির্ভর করছে।

—আপনি ওকে গার্ড দিলে আমার আপত্তির কারণ নেই।

কর্নেল বললেন।—বনানী যে আপনার আপত্তি মানবে না, তা তো আপনি ভাল বোঝেন। একটু আগে সে-কথা বনানী নিজেই বলেছে। অথচ সমস্যাটা থেকে যাচ্ছে।

—কী সমস্যা?

কর্নেল কফিতে শেষ চুমুক দিয়ে চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—ইন্দ্রজিৎ রায়কে আপনার চেনার কথা। সে বনানীর সঙ্গে আপনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। তা ছাড়া মাঝে মাঝে বনানীকে চিঠি লিখত।

যতীনবাবু আস্তে বললেন—হ্যাঁ। এই সাংবাদিক ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম, সে নাকি স্যুইসাইড করেছে।

—ইন্দ্রজিতের ব্রিফকেসে বনানীর লেখা একটা চিঠি আমি পেয়েছি। বলে কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা খাম বের করলেন। বনানীকে সেটা দেখিয়ে বললেন—তোমার চিঠি। খামে তোমার হস্তাক্ষর। তাই না? শংকর হাজরা নামেই ইন্দ্রজিৎ বাহারিনের মানামায় ছিল। কাজেই সেই নামে তুমি চিঠি লিখতে।

বনানী শুধু মাথা নাড়ল। তাকে হতচকিত দেখাচ্ছিল।

—এই চিঠিতে তুমি ইন্দ্রজিৎকে লিখেছিলে,...হ্যাঁ, সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশটুকু পড়ে শোনাচ্ছি। বলে কর্নেল টেবিলবাতির সুইচ অন করে দিলেন। তারপর চিঠিটা বের করে দ্রুত চোখ বুলিয়ে পরের পাতায় গেলেন।—'আমার সন্দেহ, বাবা আমার চিঠি খুলে পড়েন। তুমি আর বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লিখবে না। অফিসের ঠিকানাতেও লেখা ঠিক নয়। বরং মিমির কেয়ার অবে চিঠি পাঠাবে। মিমিকে আমি বলে রাখব। তুমি লিখেছ, আগের লেখা চিঠির সঙ্গে তোমার কোন বন্ধুকে লেখা একটা মেসেজ ছিল। আমি কিন্তু চিঠিটাই পাইনি। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি। বাবা কেন রেগে গেলেন বুঝতে পারছি না। যাই হোক, তোমার বন্ধুকে সরাসরি তার ঠিকানায় মেসেজ পাঠানোর কি কোনও অসুবিধা আছে? যদি থাকে, আমার চিঠির সঙ্গে আবার পাঠিও। আমি

পেঁছে দেব।' কর্নেল চিঠি ভাঁজ করে খামে ঢোকালেন। তারপর যতীনবাবুর দিকে তাকালেন।

যতীনবাবু পাথরের মূর্তির মতো বসে ছিলেন। এবার ঠোঁট ফাঁক করলেন কিছু বলার জন্য। কিন্তু বললেন না। বনানী ঠোঁট কামড়ে ধরে মুখ নামাল।

কর্নেল বললেন—যতীনবাবু। আপনার মেয়েকে লেখা ইন্দ্রজিতের চিঠিটা আপনি রাগের বশে ছিঁড়ে ফেলতেই পারেন। কিন্তু ইন্দ্রজিতের বন্ধুকে লেখা মেসেজটি না ছেঁড়ারই কথা। আমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছি না যতীনবাবু! আমার যুক্তিবোধ আমাকে এই সিদ্ধান্তে পেঁছে দিচ্ছে।

এবার যতীনবাবু গোমড়ামুখে শার্টের ভেতর পকেট থেকে একটা হলদে রঙের ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন। তারপর সেটা কর্নেলের দিকে এগিয়ে দিলেন। তাঁর হাত কাঁপছিল। গলার ভেতর বললেন—এক চোর আরেক চোরকে চিঠি লিখছে। পড়ে দেখলেই বুঝবেন কেন আমি ওটা ছিঁড়ে ফেলিনি। পুলিশের হাতে তুলে দিতাম। শুধু বনির কথা ভেবেই—

বনানী ফুঁসে উঠল।—তা হলে সত্যি তুমি আমার চিঠি খুলে পড়তে?

যতীনবাবু অমনি খাপ্পা হয়ে গেলেন। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন—ওই বখাটে হারামজাদার কথা মিমি ধানবাদে থাকতে আমাকে অসংখ্যবার বলেছে। আমি ওর হিস্ট্রি আদ্যোপান্ত জানি। মিমির মায়ের কাছেও কম কেচ্ছা শুনিনি। সেই হতচ্ছাড়াকে সঙ্গে করে একদিন তুই যখন গেলি, আমি ইচ্ছে করেই সব চেপে গিয়েছিলাম। কিন্তু মনে মনে ঠিক করেছিলাম আর নয়। এবার তোকে মুখোমুখি সাবধান করে দেব। ওর সব কীর্তি ফাঁস করে দেব।

কর্নেল কাগজটা পড়ছিলেন। বললেন—প্লিজ যতীনবাবু। উত্তেজিত হবেন না।

যতীনবাবুর মধ্যে যেন এতদিনের চাপা রাগের বিস্ফোরণ ঘটেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—ভাববেন না, ওটা আমি কোনও অসৎ

উদ্দেশ্যে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম। একদিন-না-একদিন ওটা পুলিশের হাতেই তুলে দিতাম। এবার আপনারা ওটা নিয়ে যা খুশি করুন, আমার মাথাব্যথা নেই। শুধু একটা অনুরোধ, আমার নির্বোধ মেয়ে যেন বিপদে না পড়ে—অনুগ্রহ করে একটু দেখবেন।

বনানীর বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে ঢুকিয়ে ঘড়ি দেখে বললেন —মিনিট কুড়ি পরে আমরা বেরুব। তার আগে একটা জরুরি টেলিফোন করে নিই।

কর্নেল টেলিফোনের ডায়াল করতে থাকলেন। সেই ফাঁকে বনানীকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা মিস সেন, ইন্দ্রজিৎবাবু কলকাতায় আসার পর ওঁর বন্ধুকে পাঠানো এই মেসেজ সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলেননি ?

বনানীকে আড়ষ্ট দেখাচ্ছিল। একটু চুপ করে থেকে বলল—না।

—আপনি কিছু জিজ্ঞেস করেননি ?

—আমার মনে পড়েনি।

—আপনাকে টেলিফোনে কেউ দেখা করতে বলছে, ইন্দ্রজিৎকে কি সেটা জানিয়েছিলেন ?

বনানীর মুখে বিরক্তিকর ছাপ ফুটে উঠল।—আপনি তো সাংবাদিক। আজকাল ইভটিজিং কতভাবে হয় আপনার জানার কথা। আমি ন্যাচার‍্যালি কোনও ইভ-টিজারের কথাই ভেবেছিলাম। তাই ওনিয়ে মাথা ঘামাইনি।

ওর কথায় যুক্তি আছে। কাজেই চুপ করে গেলাম। কর্নেল টেলিফোনে চাপা গলায় কার সঙ্গে কথা বলার পর ঘুরে বসলেন। একটু হেসে বললেন—জয়ন্তের মুখ দেখে বুঝছি, ইন্দ্রজিতের মেসেজে কী আছে জানার জন্য অস্থির হয়েছ। বনানীরও কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। তবে বনানীর বাবা বলে গেলেন, 'এক চোর আরেক চোরকে চিঠি লিখছে।' এ থেকে দুজনেই আঁচ করতে পারছ মেসেজে কী থাকা উচিত। বিশেষ করে দুজনেই যখন মানামার মুক্তোব্যবসায়ী শেখ সায়েবের মুক্তোচুরির কথা জানো। জয়ন্ত গোড়া থেকেই জানো। বনানী জেনেছে আজ সন্ধ্যায় আমার কাছে।

বনানী কিছু বলার আগেই আমি বললাম—ইন্দ্রজিতের সেই বন্ধুর নাম ঠিকানা ওতে নিশ্চয় আছে ?

—আছেই তো। না থাকলে বনানী তাকে মেসেজ পৌঁছে দেবে কেমন করে ?

—কে সে ?

বনানীও আমার প্রশ্নের সঙ্গে বলে উঠল—তা হলে সে-ই আমাকে মেট্রো সিনেমার সামনে দেখা করতে বলছে। আপনি আগেই তাকে পুলিশে ধরিয়ে দিন।

কর্নেল চুরুট অ্যাশট্রেতে গুঁজে বললেন—ইন্দ্রজিতের সেই বন্ধুর তোমাকে ওভাবে দেখা করতে বলার কারণ থাকতে পারে না। ইন্দ্রজিৎ সম্প্রতি কলকাতা এসেছিল। তার সেই বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই মেসেজটার আর কোনও গুরুত্ব তার বন্ধুর কাছে থাকার কথা নয়।

বললাম—সেই বন্ধুটি কে ?

—মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির ডেটা রিসার্চ সেকশনের ইনচার্জ এবং বনানীর বস্ ডঃ সুন্দরম।

বনানী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। বললাম—তা হলে বলতে চান, কোনও থার্ড পার্টি মেসেজটা হাতাতে চাইছে ?

—ঠিক তাই। ভারতে বিদেশ থেকে প্রাকৃতিক মুক্তো আমদানি নিষিদ্ধ। চোরা পথে আসে। সুন্দরম তাঁর কোম্পানির সুযোগ নিয়ে আপনে ব্যক্তিগতভাবে দালালি করেন। ইন্দ্রজিৎ তাঁকে খদ্দের ঠিক করতে বলেছিল। কাজেই ইন্দ্রজিতের চিঠিটা হাতাতে পারলে ডঃ সুন্দরমকে ব্ল্যাকমেল করা যাবে। ভেবে দেখ জয়ন্ত ! ডঃ সুন্দরমের ওপর গণেশলাল প্রসাদের বিশ্বাস নষ্ট হবে এবং তাঁর চাকরি যাবে। কিন্তু এর চেয়ে সাংঘাতিক বিপদ হল, কাস্টমস এবং সি বি আই জানতে পারলে ডঃ সুন্দরমকে জেল খাটতে হবে। কাজেই কেউ ডঃ সুন্দরমকে ব্ল্যাকমেল করার জন্যই চিঠিটা হাতাতে চাইছে।

—কিন্তু ইন্দ্রজিতের চিঠিটার কথা কোনও থার্ডপার্টি জানল কী করে ?

কর্নেল বনানীর দিকে তাকালেন—বনানী, অনেক সময় আমরা জানিনা যে আমরা কী জানি। তুমি মিমির কেয়ার অবে ইন্দ্রজিৎকে চিঠি লিখতে বলেছিলে। তারপর নিশ্চয় মিমিকে জানিয়েছিলে ইন্দ্রজিতের চিঠি তার কেয়ার অবে আসবে?

বনানী বলল—হ্যাঁ। বাবার ওই কুঅভ্যাসের কথাও বলেছিলাম।

—ইন্দ্রজিতের একটা চিঠি তুমি যে পাওনি, সে-কথাও কি বলেছিলে?

বনানী একটু ভেবে নিয়ে বলল—বলেছিলাম। কিন্তু মিমি—

ওর কথার ওপর আমি বললাম—কর্নেল! মিমি কথাটার গুরুত্ব না বুঝেই হয়তো কোনও বয়ফ্রেণ্ডকে বলেছিল। সেই বয়ফ্রেণ্ডই থার্ডপার্টি। মিমিকে চার্জ করা উচিত।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—চার্জ করার সময় পরে পাওয়া যাবে। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক। আমার এই মার্কামারা চেহারা নিয়ে তোমার গাড়ি থেকে বেরুব না। তুমি—নাহ্। তোমারও বেরুনোর দরকার নেই। আমরা কাছাকাছি থাকব। বনানী! একটুও ভয় পেয়োনা। কেউ এসে তোমার সঙ্গে কথা বললে তুমি এটা তার হাতে দেবে। দিয়েই কিন্তু চলে আসবে আমাদের গাড়িতে। যা কিছু ঘটুক, তুমি পিছু ফিরে দাঁড়াবে না। সাবধান।

কর্নেল পকেট থেকে ভাঁজ করা সেই হলুদ কাগজটা বনানীকে দিলেন। বনানী সেটা পার্সে ঢোকাল। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পথে যেতে যেতে কর্নেল বনানীকে জানিয়ে দিলেন আমাদের গাড়ি থাকবে মেট্রো সিনেমার সামনা সামনি উল্টো দিকের ফুটপাতের কাছে।

এস এন ব্যানার্জি রোডের মোড়ে বনানীকে গাড়ি থেকে নামতে বললেন কর্নেল। বনানী নেমে গেলে ডাইনে গাড়ি ঘুরিয়ে চৌরঙ্গীতে গেলাম। মেট্রো সিনেমার সামনা সামনি পশ্চিমে পার্কিং জোনে গাড়ি দাঁড় করলাম। রাস্তায় গাড়ির ভিড়। সিনেমা হলের সামনে কিছু ঘটলেও দেখার উপায় নেই। আমি উদ্বিগ্ন। কিন্তু কর্নেল টুপির আড়ালে চুরুট টানছেন নির্বিকারভাবে।

কতক্ষণ পরে দেখলাম বনানী হন্তদন্ত এগিয়ে আসছে অনেকগুলো চলন্ত গাড়ি এড়িয়ে সে আমাদের গাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাদের গাড়ি খুঁজতে থাকল। আমি চাপা স্বরে ডাকলাম—মিস সেন! তখন সে গাড়িটা চিনতে পারল।

গাড়িতে ঢুকেই সে উত্তেজিতভাবে বলল—বেঁটেমতো একটা লাল শার্টপরা লোক। মুখে দাড়ি আছে। আমাকে দেখে সে এগিয়ে এসে 'হাই' করল। আমি আপনার কথামতো তার হাতে চিঠিটা দেবার জন্য পার্স খুলেছি, হঠাৎ কজন লোক ভিড় থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অমনি আমি চলে এলাম। চিঠিটা দেওয়া হল না। এই নিন।

কর্নেল চিঠিটা নিয়ে পকেটে ঢুকিয়ে বললেন—চলো জয়ন্ত! বনানীকে বাড়ি পেঁছে দিয়ে আসি।...

সাত

বনানী থাকে উত্তর কলকাতায় শ্যামপুকুর পার্কের কাছে। কিন্তু ঠিকানার এই সূত্রটা দিয়েই সারা পথ সে চুপচাপ পিছনের সিটে বসে ছিল। সামনের সিটে কর্নেল তেমনি নির্বিকার ভঙ্গিতে চুরুট টানছিলেন। তিনিও কোনও কথা বলছিলেন না। আমি তাঁর দিকে বারবার তাকাচ্ছি লক্ষ্য করে একবার শুধু মুখ খুললেন। তুমি নিশ্চিত হতে পারো জয়ন্ত, আর সেই লাল মারুতিটা তোমার গাড়িকে ফলো করবে না।

একথায় ওঁর স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক ছিল না। কাজেই বুঝতে পারলাম, উনি গুরুতর চিন্তাভাবনায় ডুবে থাকতে চান। বরাবর দেখে আসছি, বৃদ্ধ রহস্যভেদী তুম্বো মুখে চুরুট কামড়ে ধরে থাকলে একশোবার কোনও প্রশ্ন করেও জবাব পাব না।

বনানীর পক্ষে হতবাক হয়ে থাকা স্বাভাবিক। অপ্রত্যাশিত ঘটনার ধাক্কা নিশ্চয় সে সামলাতে পারছিল না। শ্যামপুকুর পার্কের কাছাকাছি গাড়ি পেঁছুলে সে আস্তে বলে উঠল—আমাকে এখানেই

নামিয়ে দিন।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে বললাম—অসুবিধে হবে না তো?

—নাহ্। কাছেই। বলে গাড়ি থেকে সে নেমে কর্নেলের কাছে গেল। উদ্বিগ্নভাবে বলল—কর্নেল সরকার! লোকটাকে যে চিঠিটা দেওয়া গেল না, এতে বাবার কোনও বিপদ হবে না তো?

কর্নেল গলার ভেতর বললেন—না। উনি সম্পূর্ণ নিরাপদ।

—আমার বড্ড অস্বস্তি হচ্ছে কর্নেল সরকার!

—অস্বস্তির কারণ নেই। বরং চিঠিটা যে তুমি ফিরিয়ে আনার সুযোগ পেয়েছ, এটা আমার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত ছিল। লোকগুলো বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে বলেই অবশ্য সুযোগটা পেয়েছ তুমি।

—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। ওরা কারা?

—ওরা যারাই হোক, তা নিয়ে চিন্তা কোরো না।

—ডঃ সুন্দরমকে এসব কথা বলা উচিত হবে কি?

কর্নেল আমাকে অবাক করে বললেন—অবশ্যই বলবে। তবে গোপনে। ঘটনাটা ওঁর জানা দরকার।

বনানী যেন আরও কিছু বলতে চাইছিল। কর্নেল আমাকে ইশারায় এগিয়ে চলার নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণ পরে বললাম—ঘটনাটা বনানী বুঝতে না পারলেও আমি সম্ভবত বুঝতে পেরেছি।

—কী বুঝতে পেরেছ?

—লোকটার ওপর যাদের ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেছে বনানী, তারা সাদা পোশাকের পুলিশ।

এতক্ষণে কর্নেল একটু হাসলেন।—হ্যাঁ, পুলিশ। তবে স্বয়ং ডি সি ডি ডি-র নির্দেশ বলেই তাদের তর সয় নি। বর্ণনা অনুসারে একটা লোক এক যুবতীর দিকে এগিয়ে এসে সম্ভাষণ করতেই তারা তাকে ধরে ফেলেছে। বনানীর সঙ্গে কথা বলা এবং চিঠিটা সে পাওয়ার পর ধরা পড়লে ডঃ সুন্দরম ঝামেলায় পড়তেন।

—ডঃ সুন্দরম ঝামেলায় পড়লে আপনার কী?

—ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ীকে যখন আমার এই ফাঁদ পাতার প্রস্তাব দিই, তখন পয়েন্টটা আমার মাথায় আসেনি। পরে যখন

এল, তখন আর কিছু করার ছিল না।

—আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন না কিন্তু!

একটু চুপ করে থেকে কর্নেল বললেন—ডঃ সুন্দরমের সাহায্য আমার দরকার।

—কিন্তু উনি তো আপনাকে পছন্দ করেন না। অফিস থেকে প্রায় ধমক দিয়েই তাড়িয়ে দিলেন সেদিন।

—সেই কারণেই বলছি, শেখসায়েবের মুক্তো উদ্ধার এবং ইন্দ্রজিতের হত্যা রহস্যের একটা যোগসূত্র ডঃ সুন্দরমের কাছে পাওয়ার আশা করছি।

—ওঃ বস্! আর হেঁয়ালি অসহ্য লাগছে।

—আমাদের প্রতি ডঃ সুন্দরমের অমন অদ্ভুত আচরণের কথা চিন্তা করো জয়ন্ত! ওঁর হাবভাব, রিঅ্যাকশন খুঁটিয়ে স্মরণ করো! এ কি সেই 'ঠাকুর ঘরে কে রে, আমি কলা খাইনি' হয়ে গেল না?

কর্নেল জোরালো হেসেই হঠাৎ বলে উঠলেন—বাস! তোমাকে আর কষ্ট দিতে চাইনে। আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও। ট্যাক্সি করে ফিরব। আর ডার্লিং! তোমার এবার বিশ্রাম দরকার।

গাড়ি দাঁড় করালাম। কর্নেল ব্যস্তভাবে নেমে গেলেন। তারপর ওঁকে একটা খালি ট্যাক্সির দিকে প্রায় দৌড়ে যেতে দেখলাম! অনেক প্রশ্ন মাথার ভেতর ভনভন করছিল। কিন্তু কী আর করা যাবে?

সেই বজ্জাত লাল মারুতি সম্পর্কে কর্নেলের আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও অস্বস্তিটা কাটছিল না। সল্ট লেকে ফেরার পথে কল্পিত বা বাস্তব কয়েকটা লাল মারুতি আমাকে উত্যক্ত করছিল। কিন্তু কোনোটাই আমার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত খারাপ ব্যবহার করেনি।

খাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে ঘুমের চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু অসংখ্য প্রশ্ন মাছির মতো মাথার ভেতর বেজায় রকমের ভনভন করতে থাকল। অগত্যা টেবিল বাতি জেলে আমার প্রিয় লেখক জর্জ সিমেনোর একটা গোয়েন্দা অমনিবাসের পাতায় চোখ রাখলাম।

কয়েক পাতা পড়ার পর সবে ঘুমের টান এসেছে, এমন সময়

বিরক্তিকর টেলিফোনের শব্দ। আমার একটা বদ অভ্যাস আছে। শুয়ে পড়ার পর টেলিফোন বাজলেই রিসিভার তুলে ধরে বলি— রং নাম্বার।

ঠিক তা-ই বলতাম। কিন্তু কর্নেলের কথা ভেবে সংযত হলাম। ট্যাক্সি করে বাড়ি ফেরার কথা। এখনও ফেরেননি দেখে উদ্বিগ্ন ষষ্ঠী টেলিফোন করছে না তো?

কিন্তু সাড়া দিতেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের অনবদ্য কণ্ঠস্বর ভেসে এল।—জয়ন্তবাবু! একটু ডিসটার্ব করলাম। কর্নেল স্যারেরে পাইলাম না। অলওয়েজ এনগেজড সাউন্ড! কাজেই আপনারেই ধরলাম। এস টি ডি-তে ধরছি। বুঝলেন তো?

—কোথা থেকে ধরলেন হালদারমশাই? চোরডিহা তো জঙ্গল শুনেছি।

—ফ্রম আসানসোল জয়ন্তবাবু! আউগ্গাইয়া আইতে হইল।

—বলুন হালদারমশাই!

—চোরডিহারে জঙ্গল কইলেন? পুরা জঙ্গল না। টাউনও আছে, জঙ্গলও আছে। তো কথা হইল গিয়া—চন্দ্র জুয়েলার্সের কুঞ্জবাবুরে টাকা লইয়া আইতে কইছিলাম। কিন্তু উনি আইবেন কি না, জানা দরকার। ওনাদের লাইন পাইলাম না। আপনি কিছু জানেন?

—জানি। কুঞ্জবাবু টাকা নিয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে রওনা হয়ে গেছেন। কর্নেল ওঁকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন।

—কী কাণ্ড! সন্ধ্যার ট্রেন মানে তো ছটা পাঁচ। ফ্রম আসানসোল গয়া প্যাসেঞ্জার ছাড়ার টাইম হইল গিয়া সওয়া এগারোটা। খাইছে! বারোটা কুড়ি বাজে। সর্বনাশ!

ফোন ছেড়ে দিলেন প্রাইভেট ডিটেকটিভ। মনশ্চক্ষে দেখতে পেলাম উনি স্টেশনের দিকে বুনো ঘোড়ার মতো দৌড়ে চলেছেন। কিন্তু ওঁকে বলার সুযোগ পেলাম না, কুঞ্জবাবুর সঙ্গে সাদা পোশাকের কজন পুলিশও গেছে। কাজেই হালদার মশাইয়ের দুর্ভাবনার কারণ নেই।

কর্নেলকে টেলিফোন করে হালদারমশাইয়ের ব্যাপারটা জানিয়ে দেব ভাবলাম। পরে মনে হল, এ খবর সকালে গিয়ে মুখোমুখি জানালেও চলবে।
কিন্তু হালদারমশাইকে একটা কথা জিজ্ঞেস করা হল না যে! যে গাড়িতে হরনাথবাবুকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং হালদারমশাই যার পেছন-পেছন ধাওয়া করে বনেটে উঠেছিলেন, সেটা লাল মারুতি কিনা।
ঘুম ভাঙল সাড়ে আটটায়। ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে পড়লাম। কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দেখি, ড্রয়িং রুমে কর্নেলের মতোই লম্বা-চওড়া এবং টাই-সুটপরা মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক বসে আছেন। পায়ের কাছে একটা ব্রিফকেস। কর্নেল ইসারায় আমাকে বসতে বললেন। ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে আমাকে দেখে থেমে গিয়েছিলেন। আমার দিকে উনি সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকালে কর্নেল ইংরেজিতে বললেন—আলাপ করিয়ে দিই। জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক। আর জয়ন্ত, ইনি মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ গণেশলাল প্রসাদ।
উত্তেজনা চেপে রেখে নমস্কার করলাম। ইনিই সেই প্রসাদজি এবং এঁকে তাহলে শেষ পর্যন্ত কর্নেলের কাছে আসতে হয়েছে!
প্রসাদজি গম্ভীর মুখে আমাকে নমস্কার করে কর্নেলকে বললেন—একটা অনুরোধ কর্নেল সরকার। আমি খবরের কাগজের খবর হওয়া পছন্দ করি না। অবশ্য খবরের কাগজে আমার কোম্পানির বিজ্ঞাপন দিতে হয়। কিন্তু—
কর্নেল তাঁর কথার ওপর বললেন—আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন মিঃ প্রসাদ! আপনাকে নিয়ে জয়ন্ত কোনও খবর করবে না। তাছাড়া আপনি যদি ভাবেন, আমাকে যা বলছেন, তা জয়ন্ত জানবে না, সে-ও ভুল হবে। আপনি যা বলছিলেন, তা স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।
একটু ইতস্তত করে প্রসাদজি বললেন—ডঃ সুন্দরমকে আপনি বলেছেন আমি নাকি ইন্দ্রজিৎকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিলাম, আপনার

এই ধারণা ঠিক নয়। শেখসায়েব আমার সাথে দেখা করেছিলেন এবং তাঁর এক কর্মচারী শংকর হাজরা মুক্তো চুরি করে পালিয়ে এসেছে, একথাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি জানতাম না শংকর হাজরাই ইন্দ্রজিৎ রায়। কাজেই ইন্দ্রজিৎকে ফাঁদে ফেলার প্রশ্নই ওঠে না।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—শংকর হাজরাকে আপনি চেনেন বা চিনতেন ?

—নাহ্। তার নামও শুনিনি কখনও। শেখসায়েবের মুখে প্রথম শুনেছি।

—ইন্দ্রজিৎ আপনাদের ট্রেডিং ইনফরমার ছিল ?

প্রসাদজি একটু হাসলেন।—ডঃ সুন্দরমের সঙ্গে ওর বন্ধুতা ছিল। আমার কোম্পানি গালফ এলাকার শুধু মুক্তো নয়, সবরকম ব্যবসা-বাণিজ্যেরই খবর সংগ্রহ করে। তা ছাড়া আমরা এসব ব্যাপারে কমিশন-এজেন্টও রাখি। ইন্দ্রজিৎকে একজন সেইরকম এজেন্ট বলতে পারেন।

—আচ্ছা মিঃ প্রসাদ, আপনি কি মহাজাতি সদনে ম্যাজিক শোয়ের দুটো টিকিট হরনাথ চন্দ্রকে দিয়েছিলেন ? গত রবিবার নাইট শোয়ের টিকিট ?

প্রসাদজির মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল।—ম্যাজিক শোয়ের টিকিট ! আমি হরনাথ চন্দ্রকে—সম্পূর্ণ অসম্ভব, কর্নেল সরকার ! চূড়ান্ত অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব মিঃ প্রসাদ ?

—চন্দ্র জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক বাজারে, বিশেষ করে গালফ এলাকায় এখন আমার কোম্পানির একনম্বর শত্রু। প্রতিযোগী বলছি না লক্ষ্য করুন। শত্রু বলছি।

—শত্রু ! কেন ?

প্রসাদজি ঘড়ি দেখে বললেন—সে অনেক কথা। সংক্ষেপে বলছি। চন্দ্র জুয়েলার্স আমার কোম্পানির মাধ্যমেই গালফ এলাকায় ঢুকেছিল। পরে টের পেলাম হরনাথ আমাদের পিঠে ছুরি মারার চেষ্টা করছেন। চোরাপথে পাচার হয়ে আসা জুয়েলার্স লাক্সারি

গুডস হার্ড কারেন্সি এসব নিয়েও আমরা কারবার করি। অনেকেই করে। তো হঠাৎ দফায়-দফায় কাস্টমসের হানায় আমরা জেরবার হচ্ছিলাম। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এর পেছনে হরনাথের হাত আছে। বোম্বেতে ওঁর ব্রাঞ্চ খোলার উদ্দেশ্যও বুঝতে পারলাম। উনিও একই কারবারে নেমেছেন। তখন বাধ্য হয়ে ওঁর বোম্বে ব্রাঞ্চের পেছনে গুণ্ডা লাগাতে হল। সেই ব্রাঞ্চের একটা লোকের প্রাণ গেল।

—তারই নাম ছিল শংকর হাজরা।

প্রসাদজি একটু চমকে উঠলেন।—বলেন কী! আমি অবশ্য তার নাম নিয়েই মাথা ঘামাইনি।

—যাই হোক, আপনি নিশ্চয় জানেন ইন্দ্রজিৎ রায়, চন্দ্র জুয়েলার্সের কর্মচারী ছিল?

—জানতাম বলেই ওকে গুরুত্ব দিতাম।

—ওই ঘটনার পর ইন্দ্রজিৎকে চন্দ্র জুয়েলার্স বোম্বে ব্রাঞ্চের চার্জে পাঠিয়েছিল।

—জানি। তবে ইন্দ্রজিৎ আমাদের এজেন্ট। তাই তার কোনও ক্ষতি যাতে না হয়, সে-ব্যবস্থা করেছিলাম। তারপর ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র জুয়েলার্সের চাকরি ছেড়ে কী করে গালফ এলাকায় চলে গেল জানি না।

—মিঃ প্রসাদ। ইন্দ্রজিৎ যে আপনাদের এজেন্ট, হরনাথ টের পেয়েছিলেন। তাই তার চাকরি গিয়েছিল। তখন সে মৃত শংকর হাজরার পাসপোর্ট জাল করেই গালফে গিয়েছিল।

প্রসাদজি মাথা নেড়ে বললেন—আমি জানি না। তবে সে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। শুধু এটুকু বলতে পারি।

—আপনি জানতেন না ইন্দ্রজিৎ মানামায় থাকে এবং শেখসায়েবের ফার্মে চাকরি করে?

—মানামা থাকে জানতাম তবে সে শেখসায়েবের ফার্মেই চাকরি করে, তা জানতাম না।

—বনানী সেনের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের সম্পর্কের কথা কি জানতেন?

—ডঃ সুন্দরম বলেছিলেন। ইন্দ্রজিতের সুপারিশে মিস সেনকে

চাকরি দিয়েছিলাম।

—হরনাথবাবুর ভাই কুঞ্জনাথকে আপনি চেনেন?

—নামে চিনি মাত্র। প্রসাদজি আবার ঘড়ি দেখে বললেন—এবার বলুন, আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলেছেন কেন? দেখা করলে আমি নাকি লাভবান হব, তা-ও বলেছেন। এর অর্থ কী?

—মিঃ প্রসাদ! হোটেল কণ্টিনেণ্টালের অন্যতম মালিক আপনি। শেখসায়েবকে ওভাবে হোটেল ছাড়া করে স্বদেশে পাঠাতে ব্যস্ত হলেন কেন?

প্রসাদজির মুখটা মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে বললেন—ওঁর নিরাপত্তার জন্য। ওঁর ক্ষতি হলে আমার কোম্পানির ক্ষতি হবে। উনি জেদি হঠকারী মানুষ। উনি হরনাথের পাল্লায় পড়েছিলেন। তাই ওঁকে বাঁচানোর জন্য ওঁর পাসপোর্ট চুরি করিয়েছি। তবে দিল্লিতে গিয়েই উনি পাসপোর্ট ফেরত পেয়ে যাবেন।

—কিন্তু আপনি যে নিজেও বিপন্ন, মিঃ প্রসাদ!

—তার মানে?

—শেখসায়েবের মুক্তো উদ্ধারের চেষ্টা করছেন আপনি। এই চেষ্টা না করাই আপনার পক্ষে নিরাপদ। ধরে নিচ্ছি, মুক্তো উদ্ধার করে শেখসায়েবকে ফেরত দেওয়াই হয়তো আপনার উদ্দেশ্য। কিন্তু তা করতে গিয়ে আপনি বিপজ্জনক ফাঁদে পা দিচ্ছেন। আপনি এ চেষ্টা থেকে সরে দাঁড়ান মিঃ প্রসাদ!

প্রসাদজি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—কর্নেল সরকার! আপনার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। তবে আমি কী করব বা না করব, সেজন্য অন্যের পরামর্শের আমি মুখাপেক্ষী নই। আপনি অকারণে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করলেন।

বলে সশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন গণেশলাল প্রসাদ।···

আট

ডঃ সুন্দরম চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, সেই

সময় কর্নেল বললেন—একটু বসুন ডঃ সুন্দরম ! কথা আছে।
ঘড়ি দেখে ডঃ সুন্দরম বললেন—আমার তাড়া আছে। যাই হোক, বলুন।
—আপনি বসুন।
অনিচ্ছার ভঙ্গিতে মুক্তা বিশেষজ্ঞ বসলেন। বললেন—যা বলার একটু তাড়াতাড়ি বললে ভাল হয়। প্রসাদজি আজ আমাকে অফিসে না পেলে রাগ করবেন। জরুরি কনফারেন্স আছে সওয়া এগারোটায়।
কিছুক্ষণ আগে প্রসাদজি আমার কাছে এসেছিলেন।
ডঃ সুন্দরম আস্তে বললেন—জানি। আমাকে রিং করে জানিয়ে ছিলেন।
—আগের দিন প্রসাদজি পাঠিয়েছিলেন প্রাইভেট সেক্রেটারি যোগীন্দ্র শর্মাকে। আমি পাত্তা দিইনি।
—তাও আমি জানি। প্রসাদজি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করেন না। আমার প্রতি ওঁর অগাধ আস্থা আছে।
কর্নেল একটু হেসে বললেন—ইন্দ্রজিতের চিঠিটা সেই আস্থা ভেঙে দিত। তাই না ?
ডঃ সুন্দরম চাপা স্বরে বললেন—ঠিক তাই। কিন্তু আস্থা ভাঙার ফলটা হত আমার পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। প্রসাদজি দরকার হলে নির্বিকারভাবে কাউকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে পারেন। আমি ওঁকে ভীষণ ভয় পাই। বনানীর মুখে কথাটা শোনার পর সেইজন্যই ছুটে এসেছিলাম আপনার কাছে। এবার প্লিজ বলুন, কী কথা আছে আপনার ?
ইন্দ্রজিতের চিঠিটা আপনি ছিঁড়ে ফেললেন। কিন্তু ছেঁড়া কুচিগুলো পকেটে রাখলেন কেন ডঃ সুন্দরম ? কর্নেল তাঁর পাশের টেবিলের তলায় ওয়েস্টপেপার বাস্কেট দেখিয়ে বললেন—আপনি যেখানে বসে আছেন, সেখান থেকে এটা চোখে পড়ার কথা।
ডঃ সুন্দরম আগের মতো গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে ছিলেন। আমতা-আমতা করে বললেন—আসলে আমি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে পকেটে ঢোকাইনি। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে—

—ডঃ সুন্দরম ! শুধু কোড নাম্বারটাই যদি আপনার দরকার ছিল, তাহলে সেটা টুকে নিয়ে চিঠিটা আমার হাতে ফেরত দেওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তারপর আপনি দেখতেন, চিঠিটা নিয়ে আমি কী করছি। আমি ওটা নষ্ট না করে ফেললে আপনি আমাকে নষ্ট করে দিতে বলতেন। হ্যাঁ—এটাই স্বাভাবিক হত।

—কিন্তু আপনার কাছে জেরক্স কপি আছে বললেন! ডঃ সুন্দরম অপ্রস্তুতভাবে হাসবার চেষ্টা করলেন—কাজেই আমি তো আপনার হাতে ধরা থেকে গেলাম।

কর্নেল মাথা নেড়ে বললেন—নাহ্। জেরক্স কপিতে ইন্দ্রজিতের আসল মেসেজ থাকার কথা নয়। কোডনাম্বারটা অবশ্য আছে। কিন্তু আসল মেসেজ আছে প্রতি দুলাইনের মাঝখানে, যা জেরক্স কপিতে অদৃশ্যই থেকে যাবে। কারণ প্রকৃত মেসেজ অদৃশ্য কালিতে লেখা। বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সেটা উদ্ধার করা যায়। আমি লক্ষ্য করেছি, চিঠিটা আপনি যেভাবে ছিঁড়লেন, তাতে কুচিগুলো সহজে জোড়া দেওয়া যায়।

ডঃ সুন্দরম গলার ভেতর বললেন—আপনি কি প্রকৃত মেসেজটা পড়তে পেরেছেন?

—পেরেছি। কর্নেল শান্তভাবে বললেন।—একথা ঠিকই যে ব্ল্যাকমেলার আপনাকে চিঠিটার সাহায্যে ব্ল্যাকমেল করতে পারত। কিন্তু চিঠিতে যা লেখা আছে, তা দিয়ে নয়। প্রসাদজির মতো লোকের পক্ষে আপনার ব্যক্তিগত গোপন কারবারের কথা জানা সম্ভব। ওতে তাঁর মাথাব্যথা থাকতে পারে না। কিন্তু অদৃশ্য কালিতে লেখা প্রকৃত মেসেজ প্রসাদজির পক্ষে ক্ষতিকর হত। তাই সেটা আপনাকে ব্ল্যাকমেলের সাংঘাতিক অস্ত্র। আমি আপনার হিতাকাংক্ষী ডঃ সুন্দরম! আপনার কাছে সহযোগিতা চাইছি।

ডঃ সুন্দরম মুখ নিচু করে বললেন—সহযোগিতা করতে আমি রাজি।

—তাহলে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আশা করি আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না।

—বলুন।

—আপনি চিঠিটা পাননি জেনে ইন্দ্রজিৎ কী বলেছিল আপনাকে ?

—একটু ইতস্তত করে ডঃ সুন্দরম বললেন—বনানীর বাবার নাকি মেয়ের চিঠি খুলে পড়ার বদঅভ্যাস আছে। চিঠিটা বনানীর বাবাই হয়তো ছিঁড়ে ফেলেছেন। কাজেই ও নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

—অদৃশ্য কালিতে লেখা প্রকৃত মেসেজ কী ছিল, ইন্দ্রজিৎ নিশ্চয় তা বলেছিল আপনাকে ?

—বলেছিল। আপনি ওটা পড়েছেন যখন, তখন বুঝতেই পারছেন ঘটনাটা কোনও তৃতীয় ব্যক্তি জানতে পারলে আমাকে সহজে বিপদে ফেলতে পারত।

—পারত। তবু আপনি ওই মারাত্মক চিঠি ছিঁড়ে টুকরো করে পকেটে নিয়ে যাচ্ছেন ! এ কি নিছক কৌতূহল ?

—হ্যাঁ। তাছাড়া ইন্দ্রজিৎ যা বলেছিল, তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার ইচ্ছাও ছিল। ডঃ সুন্দরম প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢোকালেন।—ঠিক আছে। আপনি বলছেন যখন, তখন এগুলো আমি নিয়ে যেতে চাই না। আপনি ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলার কথা বলছিলেন। বরং আপনি এগুলো কুড়িয়ে ফেলুন।

চিঠির টুকরোগুলো বের করে উনি কর্নেলকে দিলেন। এবার লক্ষ্য করলাম, চিঠিটা বেশ কৌশলে ছেঁড়া হয়েছে, যাতে সহজে জোড়া দেওয়া যায়। ধুরন্ধর বৃদ্ধ রহস্যভেদীর দৃষ্টি এড়ানো সত্যিই কঠিন। তিনি সেগুলো দেখে মিলিয়ে নেওয়ার পর তাঁর প্রকাণ্ড অ্যাশট্রেতে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—এক মিনিট। আপনার কৌতূহল মেটানোর জন্য অদৃশ্য কালিতে লেখা আসল চিঠিটা নিয়ে আসছি।

ড্রয়িং রুমের কোণ থেকে একটা লকার খুলে একটা সাদা কাগজ নিয়ে এলেন কর্নেল। ইজিচেয়ারে বসে বললেন—আগে বলুন ইন্দ্রজিৎ কী মেসেজ পাঠিয়েছে বলেছিল ?

ডঃ সুন্দরম শুকনো ঠোঁট জিভের ডগায় ভিজিয়ে ফ্যাঁসফেসে গলায় বললেন—ও নাকি লিখে পাঠিয়েছিল, মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির বিদেশি বেনামী ইউনিটগুলোর নামঠিকানা আমি দিতে পারলে

একটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থা প্রচুর টাকাকড়ি দেবে। আমি এই অফারটা নিতে রাজি থাকলে শিগগির যেন ওকে জানাই। তো তারপর গালফওয়ার বেধে গেল। কাজেই অফারটা চাপা পড়ে গেছে।

কর্নেল বললেন—এটা দেখে নিয়ে আপনি আমাকে ফেরত দিন।

ডঃ সুন্দরমের হাত স্পষ্টত কাঁপছিল। কাগজটা দেখে নিয়ে কর্নেলকে ফেরত দিলেন। বললেন—আমার অনুরোধ, এটাও পুড়িয়ে ফেলুন।

কর্নেল কাগজটা ছিঁড়ে অ্যাশট্রেতে পুড়িয়ে ফেললেন। তারপর হাঁকলেন—ষষ্ঠী! কফি!

ডঃ সুন্দরম বললেন—আমি কফি খাব না। উঠি।

—আপনাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন। ততক্ষণে আর দু-একটা জরুরি কথা সেরে নিই।

ডঃ সুন্দরম চাপা শ্বাস ফেলে বললেন—বলুন!

—প্রসাদজির সঙ্গে চন্দ্র জুয়েলার্সের সম্পর্ক কেমন?

—ভীষণ খারাপ। আন্তর্জাতিক বাজারে পরস্পর শত্রুতার সম্পর্ক আছে।

—আপনার সঙ্গে?

—আগেই বলেছি, অনেক কোম্পানির সঙ্গে আমার গোপন ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে। এর বেশি কিছু আমাকে দয়া করে জিগ্যেস করবেন না।

—আপনি কি জানেন হরনাথ চন্দ্রকে কারা কিডন্যাপ করেছে?

—বনানী আমাকে বলেছে শুনে আমার খুব ভয় হচ্ছে। বনানী আপনার কাছেই এ কথা শুনেছে?

—হ্যাঁ। কাল সন্ধ্যায় ওকে কথাটা বলেছি। আপনি ইন্দ্রজিতের জ্যাঠামশাইকে চেনেন?

—মুখোমুখি পরিচয় হয়নি। ইন্দ্রজিতের কাছে তাঁর কথা শুনেছিলাম।

—সুপর্ণা ব্যানার্জি ওরফে মিমিকে আপনি চেনেন?

—কে সে?

—বনানীর বন্ধু। ওরা একসময় ধানবাদে পাশাপাশি বাড়িতে থাকত।

—গৌরচন্দ্র রায় নামে কেউ আপনাদের এজেন্সিতে চাকরি করে?

—হ্যাঁ। মস্তানটাইপ ছোকরা। যোগীন্দ্র শর্মা তাকে জুটিয়েছিল এজেন্সিতে।

এইসময় আমি বলে উঠলাম—কর্নেল! একি সেই গৌর, যে মিমিদের পাড়ায় থাকে? সেদিন সন্ধ্যায় মিমির অপেক্ষায় সে গলিতে দাঁড়িয়েছিল। তাই না?

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। ইন্দ্রজিতের ডেডবডি মর্গ থেকে আনতে গিয়েছিল।

ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। ডঃ সুন্দরম কফি খাবেন না বলেছিলেন। কিন্তু আগ্রহের সঙ্গে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। কর্নেল অনবরত কফি খান। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবার কফি খেতে হল আমাকে। গৌরের প্রসঙ্গটা তুলব ভাবছিলাম। মনে পড়ছিল, সেদিন সন্ধ্যায় মিমির গৌরদা সম্পর্কে কর্নেলকে আমি বলেছিলাম, বাজি রেখে বলতে পারি, ও মিমির প্রেমিক। সেই গৌর মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সিতে চাকরি করে, কর্নেল সে-খবর সম্ভবত কাল সন্ধ্যায় জোগাড় করেছেন।

ডঃ সুন্দরম বললেন—যোগীন্দ্র শর্মার সঙ্গে শুধু কলকাতা নয়, বোম্বেরও আণ্ডারওয়ার্ল্ডের যত দুর্বৃত্তের যোগাযোগ আছে। তাই প্রসাদজি কাকেও খতম করতে হলে তার সাহায্য নেন।

কর্নেল বললেন—প্রসাদজি বলছিলেন ইন্দ্রজিতের সুপারিশে বনানীকে তিনি চাকরি দিয়েছিলেন। এদিকে বনানী বলেছে, সে-ই নাকি প্রসাদজির সঙ্গে ইন্দ্রজিতের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। কার কথা সত্য?

ডঃ সুন্দরম বললেন—দুজনের কথাই সত্য, যদি তাদের নিজের নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটা বিচার করেন। ইন্দ্রজিৎ আমার পুরনো বন্ধু। তার সঙ্গে বনানীর সম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে বনানীর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তখন সে কম্পিউটার ট্রেনিং নিচ্ছিল। আমি ইন্দ্রজিৎকে বলেছিলাম, বনানীর এই এজেন্সিতে চাকরি পাওয়ার সুযোগ আছে। বনানী তখনও

জানত না ইন্দ্রজিতের সঙ্গে প্রসাদজির সম্পর্ক আছে। তারপর বনানী আমার কাছে প্রায়ই আসত চাকরির আশায়। আমি তার কথা প্রসাদজিকে বলেছিলাম। উনি দেখব-দেখছি করে এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। তারপর হঠাৎ দেখলাম বনানীর চাকরি হয়ে গেল। আমি অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন—তখন গৌর কি এজেন্সিতে চাকরি করত ?

—হ্যাঁ। গৌরের চাকরি হয়েছে একবছর আগে। বনানীর চাকরি হয়েছে মাত্র ছ'মাস আগে। ডঃ সুন্দরম আড়ষ্টভাবে হাসলেন।—এমন তো হতেই পারে, বনানী জানত না ইন্দ্রজিতের সঙ্গে প্রসাদজির আগে থেকে আলাপ আছে। বনানী আপনাকে কি বলেছে কীভাবে এবং কোথায় ইন্দ্রজিতের সঙ্গে প্রসাদজির আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ?

—বলেছে। হোটেল কণ্টিনেণ্টালে একটা পার্টি হয়েছিল। সেখানে বনানী ইন্দ্রজিৎকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়। সে প্রসাদজির সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করিয়ে দেয়। পার্টিটা দিয়েছিল দেশের এক্সপোর্ট এজেন্সিগুলির একটা ফেডারেশন। সেখানে অনেক বিদেশি প্রতিনিধিও ছিলেন।

ডঃ সুন্দরম বললেন—আমি উঠি কর্নেল সরকার! দরকার হলে আমাকে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করবেন।

উনি কর্নেলকে একটা নেমকার্ড দিয়ে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন। আমি বললাম—এই ব্যাপারটা কি গুরুত্বপূর্ণ কর্নেল ?

কর্নেল চোখ বুজে অভ্যাসমতো দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন। বললেন—কোন ব্যাপারটা ?

—বনানীর চাকরি হওয়া বা ইন্দ্রজিতকে প্রসাদজির সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেওয়ার সত্যমিথ্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর কারণ কী ?

—কারণ আছে। প্রসাদজি, বনানী এবং ডঃ সুন্দরমের স্টেটমেণ্ট থেকে একটা চিত্র ফুটে উঠল। আমার মতে, তিনজনই সত্য কথা বলেছেন। ইন্দ্রজিৎ বনানীর অজ্ঞাতসারে তার চাকরির জন্য প্রসাদজিকে সুপারিশ করেছিল। ডঃ সুন্দরম বনানীর জ্ঞাতসারে

সুপারিশ করেছিলেন। এদিকে বনানী জানত না ইন্দ্রজিতের সঙ্গে প্রসাদজির আগে থেকেই পরিচয় আছে। তারপর বনানীর হঠাৎ চাকরি হয়ে যায়। তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে ?

কিছু দাঁড়াচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

—জয়ন্ত, একটু বুদ্ধি খাটাও। বনানীর চাকরিটা হঠাৎ হয়েছিল। ডঃ সুন্দরমের মুখে 'হঠাৎ' শব্দটা গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে কি তুমি বুঝতে পারছ না বনানীর চাকরি হয়েছিল কোনও তৃতীয় ব্যক্তির গোপন সুপারিশে ?

একটু অবাক হয়ে বললাম—গৌরচন্দ্রের সুপারিশে নয় তো ?

—আমি জেনেছি, বনানী কাল সন্ধ্যা অব্দি জানত না গৌর মিমিদের পাড়ায় থাকে মিমির সঙ্গে তার প্রেম-ট্রেম আছে। কাজেই গৌরের সুপারিশের প্রশ্ন ওঠে না। বিশেষত সে সাধারণ কর্মী।

—তা হলে সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে ?

কর্নেল কিছুক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানার পর বললেন—সমস্যা হল, বনানীর ধারণা, তার চাকরি হয়েছিল ডঃ সুন্দরমেরই সুপারিশে। তাই নাকি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সে ডঃ সুন্দরমের কথামতো গোপনে চন্দ্র জুয়েলার্সকে তথ্য পাচার করে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তার চাকরির পিছনে অন্য লোকের হাত আছে। তার চেয়ে বড় প্রশ্ন, বনানীকে সে মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সিতে হঠাৎ ঢোকাল কোন উদ্দেশ্যে ?

—আপনি বনানীর কাছে তেমন কোনও আভাস পাননি ?

—কী আভাস ?

—ধরুন, তাকে কেউ তার অজ্ঞাতসারে নিজের কাজে লাগাচ্ছে, এমন কোনও সন্দেহ বনানীর মনে জেগেছে কিনা ?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আজ তুমি বাংলাদেশের ইলিশ খাচ্ছ।

প্লিজ কর্নেল ! আজ অফিসে মুখ না দেখালে চাকরি যাবে।

—তোমার চিফকে জানিয়ে দেব, তুমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার একটা রোমাঞ্চকর স্টোরির জন্য লড়ে যাচ্ছ। চলো, বেরুনো যাক। বলে কর্নেল হাঁকলেন—ষষ্ঠী ! জয়ন্ত ইলিশ খাবে। আমরা বেরুচ্ছি।

সিঁড়িতে নামার সময় বললাম—তা হলে দেখা যাচ্ছে, আমি একটা

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আপনার সামনে তুলে ধরতে পেরেছি।

কর্নেল অন্যমনস্কভাবে বললেন—কী পয়েন্ট ?

—আমি যেই বলেছি, বনানীকে কেউ হয়তো তার অজ্ঞাতসারে নিজের কাজে লাগানোর জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, অমনি আপনি ব্যস্ত হয়ে আমাকে বাংলাদেশের ইলিশ খাওয়াতে চাইলেন এবং বেরিয়ে পড়লেন।

—হুঁ। তোমার পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে—

কর্নেল হঠাৎ থেমে গেলে বললাম—তবে কী ?

—বনানীকে ডঃ সুন্দরমের মাধ্যমে কাজে লাগিয়েছেন চন্দ্র জুয়েলার্সের হরনাথবাবু। যিনি কিনা প্রসাদজির ঘোর শত্রু। বনানী নিয়মিত চন্দ্র জুয়েলার্সে গোপন তথ্য পাচার করে এসেছে।

—সে তো বনানী নিজের জ্ঞাতসারেই করেছে।

—কিন্তু ডঃ সুন্দরম এমন সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছিলেন কোন সাহসে ? এটাই প্রশ্ন।

—প্রসাদজির অগাধ আস্থা তাঁর প্রতি। শেষ সুযোগটা ডঃ সুন্দরম নিয়েছিলেন।

—তবু ঝুঁকিটা সাংঘাতিক। কাজেই ডঃ সুন্দরমকে গার্ড দেওয়ার মতো কেউ যাবতীয় ট্রেডিং এজেন্সিতেই আছে, যার সঙ্গে হরনাথের গোপন বোঝাপড়া হয়েছিল। এই আমার সিদ্ধান্ত।

—তা হলে ডঃ সুন্দরম তাকে চেনেন।

—চিনলে আমার কাছে কবুল করতেন। না করার কারণ ছিল না। আমার ধারণা, সতর্কতার দরুন হরনাথ তার নাম জানাননি ডঃ সুন্দরমকে। এবং এখন বুঝতে পারছি, সেই হচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তি, যার সুপারিশে বনানীর চাকরি হয়েছিল। ডঃ সুন্দরম শুধু জানতেন, তাঁকে গার্ড দেওয়ার লোক আছে, এই যথেষ্ট। তাই তিনি ঝুঁকি নিয়েছিলেন।

—কর্নেল! আমার পয়েন্টটা ভুলে যাচ্ছেন! সেই তৃতীয় ব্যক্তি হরনাথের সঙ্গে গোপনে বোঝাপড়া করেছিল, সে কথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমার বক্তব্য, তার নিজস্ব কোনও পৃথক স্বার্থেও বনানীকে সে ব্যবহার করেছে। বনানীর অজ্ঞাতসারেই করে এসেছে। আপনি

স্বীকার করেছেন, আমার এই পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ।

কর্নেল হাসলেন।—গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরোক্ষে। আশা করি কিছুক্ষণ পরে সেটা বুঝতে পারবে।

দুজনে গাড়িতে উঠলাম। স্টার্ট দিয়ে বললাম—আমরা যাচ্ছি কোথায়?

—যতীনবাবুর কাছে।

আর কোনও প্রশ্ন তুললাম না। সারা পথ যানজট। গত রাত্রে শ্যামপুকুর পার্কের কাছে যেখানে বনানীকে নামিয়ে দিয়েছিলাম, সেখানে পৌঁছে কর্নেল বললেন—গাড়ি এখানেই রাখো। বাড়িটা কাছাকাছি হওয়াই সম্ভব।

রাস্তার ধারে অনেকগুলো গাড়ি পার্ক করা ছিল। সেখানেই গাড়ি রেখে দুজনে একটি সংকীর্ণ রাস্তার মোড়ে গেলাম। কর্নেল একটা ছোট্ট স্টেশনারি দোকানে খোঁজ নিলেন। পাঁচতলা বাড়িটা নতুন। দোকানটার উল্টোদিকে এপ্রিলের উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে তার স্থাপত্যশ্রী।

দোতলার পাঁচ নম্বর ফ্ল্যাটের দরজায় কলিং বেলের সুইচ টিপলেন কর্নেল। একটু পরে দরজা খুলে যতীনবাবু উঁকি দিলেন। মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখে-মুখে একটা চমক খেলে গেল। গলার ভেতর বললেন—ভেতরে আসুন।

ঘরে ঢুকে কর্নেল বললেন—কয়েকটি জরুরি কথা বলতে এসেছি, যতীনবাবু!

যতীনবাবু উদ্বিগ্ন মুখে বললেন—জরুরি কথা? ঠিক আছে। বসুন।

আমরা সোফায় বসলাম। মোটামুটি ছিমছাম সাজানো গোছানো ঘর। একালের মধ্যবিত্ত বাঙালির বসার ঘর যেমন হয়। তবে বনানীর মার্জিত রুচিবোধের ছাপ আছে। শুধু প্রশ্ন জাগে, মার্জিত রুচিবোধ সম্পন্ন একটি শিক্ষিত মেয়ে কেন তার অফিসের গোপন তথ্য পাচারের কাজে লিপ্ত হয় এবং ইন্দ্রজিতের মতো একটা লোকের প্রেমে পড়ে? নাকি এই যুগটাই এমন যে সুনীতি-দুর্নীতি একাকার হয়ে গেছে, ভাল-মন্দের ভেদরেখা গেছে ঘুচে এবং তীব্র

উচ্চাকাংক্ষা মানুষকে অন্ধ করে ফেলেছে?

যতীনবাবু কর্নেলের মুখোমুখি বসলেন। কর্নেল বললেন—কাল রাতের ঘটনা আপনার মেয়ের কাছে তো শুনেছেন?

যতীনবাবু শুধু মাথা দোলালেন।

—আচ্ছা যতীনবাবু, মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সিতে বনানীর চাকরি কী সূত্রে হয়েছিল?

যতীনবাবু কর্নেলের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থাকার পর বললেন —বনি নিজেই যোগাযোগ করেছিল।

—ওই এজেন্সি আসলে একটা আন্তর্জাতিক চোরাচালানি চক্র। ওখানে চাকরি পাওয়া সহজ নয়। ওরা বিশ্বস্ত সূত্রের সুপারিশে চাকরি দেয়।

—আমি জানি না।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন—ইন্দ্রজিতের সঙ্গে বনানীর মেলামেশা আপনি পছন্দ করতেন না। তাই সুযোগ পেলে ইন্দ্রজিতের চিঠি বনানীকে আপনি দিতেন না। তাই না?

যতীনবাবু আবার মাথা দোলালেন।

—কিন্তু চিঠিগুলো কি আপনি সত্যি ছিঁড়ে ফেলতেন?

—হুঁ্যাঃ।

—নাহ্। বলে কর্নেল হেসে উঠলেন।

যতীনবাবু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন—আপনি কী বলতে চান বুঝতে পারছি না।

—মিমিরা ধানবাদে আপনার প্রতিবেশী ছিল। কলকাতা আসার পর সেই সূত্রে বনানী মিমির জ্যাঠামশাইয়ের বাড়ি যাতায়াত করত। কলকাতা আসার পর একই কলেজে ওরা পড়াশোনাও করত। আপনিও মাঝেমাঝে মিমির কাছে যেতেন। মিমি আমাকে বলেছে। পরমেশবাবুর সঙ্গে সে আপনার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।

—দিয়েছিল।

—আপনি মিমির কাছে কথাপ্রসঙ্গে বলতেন, বনানী কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়েছে। কিন্তু কোথাও চাকরি পাচ্ছে না। তাই না?

—বলে থাকব।

—মিমি আপনাকে গৌর নামে একটা ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিল। গৌর মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সিতে চাকরি করে। সেখানে কম্পিউটার-সিস্টেম আছে। এর পর বনানীর হঠাৎ চাকরি হয়ে যায়। কর্নেল চুরুটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন—এবার বাকি অংশটা আপনার কাছেই জানতে চাই, যতীনবাবু! তারপর কী হয়েছিল মিমি জানে না।

যতীনবাবু মুখ নামিয়ে বললেন—আমাকে বিপদে ফেলে আপনার কী লাভ?

—আমি আপনাকে বিপদ থেকে বাঁচানোর জন্যই এসেছি। কারণ এবার আপনি সত্যি বিপন্ন যতীনবাবু! কাজেই সব কথাগুলো বলা আপনার উচিত।

—কেন আপনি আমাকে বিপন্ন বলছেন, বুঝিয়ে বলুন।

—আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, যদি সব কথা খুলে বলেন।

যতীনবাবুকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। একটু পরে বললেন—গৌর আমাকে মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সিতে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সে বলেছিল, বনি যেন কিছু জানতে না পারে।

—গৌর কার কাছে নিয়ে গিয়েছিল আপনাকে?

—ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের প্রাইভেট সেক্রেটারী যোগীন্দ্র শর্মার কাছে।

এরপর যতীনবাবু যা বললেন, তা ভারি অদ্ভুত। যোগীন্দ্র তাঁকে প্রথমেই বলেছিলেন, বনানীকে তিনি চেনেন। ইন্দ্রজিতের সঙ্গে তার প্রফেশনাল সম্পর্কের কথাও জানেন। ইন্দ্রজিৎ নাকি এজেন্সিকে ঠকাচ্ছে তাই বনানীর চাকরি হতে পারে একটা শর্তে। শর্তটা অদ্ভুত মনে হয়েছিল যতীনবাবুর। গাল্‌ফ থেকে ইন্দ্রজিৎ বনানীকে যে সব চিঠি লেখে, সেই সব চিঠি যতীনবাবু যদি গোপনে হাতিয়ে শর্মার কাছে গৌরের মারফত পাঠান, তা হলে বনানীর চাকরি হবে শুধু তা-ই নয়, যতীনবাবুও সেজন্য নিয়মিত টাকা পাবেন। তাই যতীনবাবু তাঁর কথায় রাজি হন। মেয়ের একটা হিল্লে হবে এবং তিনিও টাকা পাবেন। কিন্তু বনানী যেন

ঘুণাক্ষরে এসব জানতে না পারে। তারপর বনানীর চাকরি হল এবং সুযোগ পেলেই যতীনবাবু বনানীকে লেখা ইন্দ্রজিতের চিঠি গৌরের মারফত পাঠিয়ে দিতেন। কোনও চিঠি খুলে পড়তেন না।

শোনার পর কর্নেল বললেন—কিন্তু দেখা যাচ্ছে একটা চিঠি আপনি খুলেছিলেন। সেটা শর্মার কাছে পাঠাননি। কেন?

যতীনবাবু বললেন—ক্রমশ আমার কৌতূহল জেগে উঠেছিল। এ কথা ঠিক যে, ইন্দ্রজিৎকে আমি পছন্দ করতাম না এবং বনি তার সঙ্গে মেলামেশা করুক, এ-ও আমি চাইতাম না। বনিকে সে নিয়মিত চিঠি লিখছে, এটা আমার কাছে খুব খারাপ লাগত। তাই শর্মা ভদ্রলোকের শর্ত মেনে নিতে ইতস্তত করিনি। আমি ভেবেছিলাম ইন্দ্রজিৎ আর বনির মধ্যে এর ফলে একটা ভুলবোঝা-বুঝি ঘটবে। সম্পর্কটা ছিঁড়ে যাবে।

—বুঝতে পারছি। কিন্তু তারপর একসময় আপনার কৌতূহল জাগল কেন?

যতীনবাবু একটু বিরক্ত হলেন এবার।—জাগবে না? ইন্দ্রজিতের চিঠি কেন যোগীন্দ্র শর্মার এত দরকার এবং চিঠিতে এমন কী আছে, তা জানার জন্য কৌতূহল জাগা কি স্বাভাবিক নয়?

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন—স্বাভাবিক। কিন্তু বিচিত্র ব্যাপার, আপনি যে চিঠিটা অবশেষে কৌতূহলী হয়ে খুলেছিলেন এবং শর্মাকে দেননি, সেটাই ছিল যোগীন্দ্র শর্মার টার্গেট। তার মানে, এই চিঠিটার জন্যই যোগীন্দ্র আপনাকে কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু তার বরাত মন্দ। সেই চিঠিটাই তার হাতছাড়া হয়ে গেল।

আমি বললাম—আপনি নিশ্চয় ডঃ সুন্দরমকে লেখা চিঠিটার কথাই বলছেন?

—হ্যাঁ। বনানীকে লেখা ইন্দ্রজিতের চিঠির সঙ্গে এমন একটা চিঠি থাকবে, যোগীন্দ্র শর্মা কোনও সূত্রে তার আভাস পেয়েছিল।

—কিন্তু ডঃ সুন্দরমকে ইন্দ্রজিতের লেখা চিঠিটার সাহায্যে সে ব্ল্যাকমেল করত। ব্ল্যাকমেল করে বড়জোর কিছু টাকাকড়ি আদায় করত। নেহাত কিছু টাকাকড়ি আদায়ের জন্য এত আয়োজন? মশা মারতে কামান দাগা?

—মশা নয়, জয়ন্ত !

ঠিক আছে। ধরে নিচ্ছি, ডঃ সুন্দরমকে সে এজেন্সি থেকে সরাতে চেয়েছিল। প্রসাদজির অগাধ আস্থা ভেঙে যেত। হয় তো প্রসাদজি ডঃ সুন্দরমকে সেই শংকর হাজরার মতো খতম করে ফেলতেন। এতে যোগীন্দ্র শর্মার কী লাভ হত ?

কর্নেল আমার প্রশ্নের কোনও জবাব দিলেন না।

যতীনবাবু বললেন—কর্নেল সায়েব ! বনির কাছে শুনলাম, সেই হলুদ কাগজে লেখা চিঠিটা যে নিতে এসেছিল, তাকে পুলিশ অ্যারেস্টও করেছে। আপনাদের কথাবার্তা শুনে বুঝছি, সে যোগীন্দ্র শর্মারই লোক। চিঠিটা বেহাত হওয়ার জন্য যোগীন্দ্র শর্মা আমার ওপর রেগে গেছে। সেজন্যই কি আপনি আমাকে বিপন্ন বলছেন ?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—হ্যাঁ। আপনি সাবধানে থাকবেন। অচেনা লোককে এড়িয়ে চলবেন।

যতীনবাবু খুব ভড়কে গেলেন এবার। কাঁপা-কাঁপা গলায় বললেন —আপনি ওই শয়তান যোগীন্দ্রকে পুলিশে ধরিয়ে দিচ্ছেন না কেন ?

—যোগীন্দ্রকে পুলিশ খুঁজছে।

অবাক হয়ে বললাম—খুঁজছে মানে ? কাল সে আপনার কাছে এসেছিল।

কর্নেল বললেন—গত রাতে লোকটা ধরা পড়ার পর পুলিশ যোগীন্দ্রের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। বাড়ির লোক বলেছে, যোগীন্দ্র বিকেলের ফ্লাইটে বোম্বে গেছে। দমদম এয়ারপোর্টের ওই ফ্লাইট-লিস্টে তার নাম আছে এবং ওই নামের একজন যাত্রী সত্যি বোম্বে গেছে। বোম্বে পুলিশকে যথারীতি সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

বলে কর্নেল উঠলেন। যতীনবাবু আড়ষ্টভাবে বললেন—তা হলে পুলিশ ওকে ধরে ফেলবে।

কর্নেল তাঁর দিকে ঘুরে বললেন—তবু আপনি সাবধানে থাকবেন। বিশেষ করে গৌর যদি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে, তাকে পাত্তা দেবেন না। তাকে ঘরে ঢুকতে দেবেন না।

দরজার কাছে যতীনবাবু বললেন—গৌর হারামজাদাকে পুলিশে ধরিয়ে দিন।

—পুলিশ তার দিকে নজর রেখেছে। তবু আপনি সাবধানে থাকবেন।

—বনির কোনও বিপদ হবে না তো?

—বনানী অফিস যাবার সময় আপনাকে কিছু বলে যায়নি?

—বলে গেছে, অফিসে গিয়ে ছুটি নিয়ে ওখান থেকে ফরাক্কায় মাসির বাড়ি যাবে। সেইজন্যই ভয় হচ্ছে।

—সকালে বনানী আমাকে রিং করেছিল। তখন আমিই ওকে কোথাও গিয়ে কয়েকটা দিন থাকার পরামর্শ দিয়েছি। আপনি বনানীর জন্য চিন্তা করবেন না। সময় হলে সে বাড়ি ফিরবে।

বলে কর্নেল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে বললাম—আমার প্রশ্নটা আবার তুলছি। হলুদ চিঠিটা যোগীন্দ্র শর্মার কী লাভ হত? ডঃ সুন্দরমকে ব্ল্যাকমেল করে কিছু টাকা আদায় কিংবা প্রসাদজির আস্থা ভেঙে দেওয়া। তাই বলছিলাম, এটা মশা মারতে কামান দাগা। আপনি শুধু বললেন, মশা নয়। তা হলে কী? ডঃ সুন্দরমকে রাগের বশে প্রসাদজি খতম করলেই বা যোগীন্দ্র শর্মার কী লাভ হত? যোগীন্দ্র শর্মার সঙ্গে ডঃ সুন্দরমের কিসের শত্রুতা ছিল?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—অদৃশ্য কালিতে লেখা মেসেজটা সম্পর্কে যখন ডঃ সুন্দরমকে জিজ্ঞেস করলাম, ইন্দ্রজিৎ ওভাবে কী লিখেছিল আপনাকে বলেনি? তখন ডঃ সুন্দরম কী বললেন, তুমি শুনেছ।

—শুনেছি বিদেশে প্রসাদজির বেনামী এজেন্সিগুলোর নামঠিকানা জোগাড় করে দিলে একটি বিদেশি গোয়েন্দাসংস্থা প্রচুর টাকাকড়ি দেবে।

—কিন্তু আমি যখন অদৃশ্য কালিতে লেখা মেসেজটা ডঃ সুন্দরমকে পড়তে দিলাম, তুমি কি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলে? স্মরণ কর জয়ন্ত?

একটু ভেবে নিয়ে বললাম—ওঁর হাত কাঁপছিল। উনি পড়ামাত্র

কাগজটা আপনাকে পুড়িয়ে ফেলতে বললেন।

—হুঁ্যা। কিন্তু জয়ন্ত, তুমি সাংবাদিক হিসেবে আবার দেখছি নিজের অযোগ্যতা প্রমাণ করছ। বরাবর তোমাকে বলে আসছি, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি না থাকলে দক্ষ রিপোর্টার হওয়া যায় না। মুখ জয়ন্ত! মানুষের মুখই হল মানসিক প্রতিক্রিয়ার প্রথম এবং স্বাভাবিক মাধ্যম। তুমি ওঁর মুখের দিকে তাকাওনি। তাকিয়েছিলে চিঠির দিকে। তাই শুধু ওঁর হাতের কাঁপুনি তোমার চোখে পড়েছিল।

অবাক হয়ে বললাম—মেসেজে অন্য কিছু ছিল?

গাড়ির কাছে পেঁছে কর্নেল হঠাৎ বাইনোকুলারে এদিক-ওদিক দেখে নিলেন। আমি গাড়ির লক খুললাম। তারপর কর্নেল গাড়িতে ঢুকে বললেন—ইন্দ্রজিৎ তার গোপন মেসেজে সত্যিই কী ছিল ডঃ সুন্দরমকে কলকাতায় এসে আর তা জানাতে চায়নি। সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছিল। এর একটাই কারণ থাকা সম্ভব। সে ততদিনে অন্য একটা পার্টির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেছিল। মেসেজটা যখন ডঃ সুন্দরম পাননি এবং বনানীর কথামতো যতীনবাবুর সেটা নষ্ট করে ফেলারই কথা, তখন ইন্দ্রজিতের পক্ষে ডঃ সুন্দরমকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ ছিল।

অস্থির হয়ে বললাম—আহা! মেসেজে কী ছিল বলুন!

—গাড়ি স্টার্ট দাও। লাঞ্চের দেরি হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশের ইলিশ, ডার্লিং!

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললাম—কথাটা না বললে কিন্তু বাংলাদেশের ইলিশ আমি খাব না।

কর্নেল একটু পরে বললেন—ইন্দ্রজিৎ মেসেজটা পাঠিয়েছিল ইরাকের কুয়েত দখলের মাত্র কিছুদিন আগে। সে ডঃ সুন্দরমকে অদৃশ্য কালিতে লিখেছিল, যুদ্ধ বাধবে বলে তার ধারণা। ইরাকের গোপন রাসায়নিক অস্ত্রকারখানার ঠিকানা এবং ম্যাপের খোঁজ সে পেয়েছে। কিন্তু সেটা হাতাতে পারলেও গাল্‌ফ অঞ্চলে থেকে ইরাকের শত্রুপক্ষকে বিক্রি করার ঝুঁকি আছে। বরং ভারতে গিয়ে ইরাকের শত্রুপক্ষের কোনও দূতাবাসের মাধ্যমে দরাদরি করা

নিরাপদ। ডঃ সুন্দরম যেন এখনই কোনও পশ্চিমী দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাখেন। জয়ন্ত! বাহারিনের শেখ জুবাইর আল-সাবার দশ লক্ষ ডলার দামের মুক্তো আসলে একটি গোপন দলিল—যাতে ইরাকের গোপন রাসায়নিক অস্ত্রকারখানার ঠিকানা এবং ম্যাপ আছে।······

নয়

কর্নেলের কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম।—বলেন কী! ইরাকের গোপন রাসায়নিক অস্ত্রকারখানার ম্যাপ চুরি করে এনেছিল ইন্দ্রজিৎ?

কর্নেল বললেন—সাবধান জয়ন্ত! অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলো না। মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

—ঠাণ্ডা মাথায় জিজ্ঞেস করছি, আপনি কি সেই ম্যাপ উদ্ধার করে ফেলেছেন?

—নাহ্। খুঁজছি।

—কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন শেখসায়েবের মুক্তো আসলে একটা গোপন ম্যাপ?

—অঙ্ক কষে জেনেছি।

—বুঝিয়ে বলুন। নৈলে কিন্তু সত্যি অ্যাকসিডেন্ট করে ফেলব।

কর্নেল হাসলেন।—বাহারিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভাল। সত্যিই সে-দেশের কোনও রত্নব্যবসায়ীর রত্ন চুরি করে কেউ ভারতে পালিয়ে এলে স্বাভাবিকভাবেই মামলাটা উঠত সরকারি পর্যায়ে। শেখসায়েব শাসক পরিবারের লোক। কাজেই তিনি নালিশ তুললে ভারত সরকার সি বি আইকে লড়িয়ে দিতেন। এটাই স্বাভাবিক পদ্ধতি। কিন্তু তা না করে তিনি গোপনে প্রসাদজির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তারপর যেই সন্দেহ হল প্রসাদজি তাঁর গোপন সত্য যেভাবে হোক টের পেয়েছেন, অমনি তিনি প্রসাদজির শত্রু হরনাথের শরণাপন্ন হলেন। শেখসায়েব 'প্রাইভেট আই' অর্থাৎ বেসরকারি গোয়েন্দার সাহায্য চেয়েছিলেন। হরনাথ তাঁকে

আমার কাছে নিয়ে এলেন। তখনই আমার খট্‌কা লেগেছিল, শেখসায়েব এই অস্বাভাবিক পদ্ধতি কেন বেছে নিয়েছেন ? এটা হল প্রথম পয়েন্ট। এবার দ্বিতীয় পয়েন্ট ইন্দ্রজিতের অদৃশ্য কালিতে লেখা চিঠি। এই হল আমার অঙ্ক।

—শেখসায়েব ম্যাপটা তাঁদের মিত্র মার্কিনজোটের হাতে তুলে দেননি কেন ?

—তুমি সাংবাদিক হয়েও বুঝতে পারছ না অসুবিধাটা কোথায় ছিল ? তোমার মনে পড়ছে না ইরাক আচমকা কুয়েত দখল করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এলাকার খুদে আরব রাষ্ট্র থেকে ধনী আরবরা দলেদলে ইউরোপ-অ্যামেরিকায় পালাতে শুরু করেছিলেন ?

—হ্যাঁ। পালানোর প্রচণ্ড হিড়িক পড়েছিল বটে।

—শেখসায়েব রাতারাতি ফ্রান্সে পালিয়ে গিয়েছিলেন। আমাকে উনি বলেছেন, মার্কিনজোটের হাতে ইরাক পরাজিত হওয়ার পর দেশে ফেরেন। তারপর নাকি আবিষ্কার করেন, ওঁর তথাকথিত 'দশ লক্ষ ডলার দামের মুক্তো' নেই।

—কিন্তু কর্নেল, একটা ম্যাপ সঙ্গে নিয়ে পালানোর মতো সময় কি পাননি শেখসায়েব ?

—শেখসায়েবের একটা কথা আমার মনে আছে। 'মুক্তোগুলো' নাকি সেদিনই এক সায়েব খদ্দেরের কিনতে আসার কথা ছিল। তাই ওগুলো দোকানেই ছিল। হঠাৎ গুজব রটে যায়, ইরাকি প্লেন মানামা আক্রমণ করতে আসছে। মানামার মানুষজন পালাতে শুরু করে। দৃশ্যটা তুমি কল্পনা করতে পারো। যুদ্ধের বিভীষিকার মুখোমুখি অনেকেরই মাথার ঠিক থাকেনা। আমি যৌবনে সৈনিক ছিলাম। দেখেছি, যুদ্ধের সময় বহু সৈনিকও আতঙ্কে উন্মাদের মতো আচরণ করে। কাজেই শেখসায়েব ম্যাপের কথা ভুলে প্রাণ নিয়ে পালাতে ব্যস্ত হবেন, এটা অস্বাভাবিক নয়।

—তা হলে বোঝা যাচ্ছে ইন্দ্রজিৎ সেই সুযোগে ম্যাপটা চুরি করেছিল।

কর্নেল হঠাৎ বললেন—চন্দ্র জুয়েলার্স হয়ে চলো। খোঁজ নেওয়া দরকার, কুঞ্জবাবু কোনও খবর দিয়েছেন কিনা।

কিছুক্ষণ পর চন্দ্র জুয়েলার্সের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। নিচের তলায় শোরুম এবং দোকান। ওপর তলায় অফিস। কর্নেল আমাকে অপেক্ষা করতে বলে দোকানে ঢুকলেন। তারপর দেখলাম এক ভদ্রলোক ওঁকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হলেন। ফুটপাতে দুজন শক্তসমর্থ গড়নের লোক দাঁড়িয়ে খৈনি খাচ্ছিল। দেখেই বুঝলাম সাদা পোশাকের পুলিশ গার্ড দিচ্ছে। তারা আমার গাড়ির দিকে সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পর কর্নেল বেরিয়ে এলেন। গাড়িতে উঠে বললেন—কুঞ্জবাবু নিরাপদে চোরডিহা পৌঁছেছেন। ট্রাঙ্ককল করেছিলেন কিছুক্ষণ আগে। কবে ফিরবেন ঠিক নেই।

—হালদার মশাইয়ের কোনও খবর দেননি কুঞ্জবাবু ?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—না আমার ভয় হচ্ছে, হালদারমশাই এবারও কোনও বিভ্রাট বাধিয়ে বিপদে পড়েছেন কিনা। বড় হঠকারী স্বভাবের মানুষ।

—কুঞ্জবাবু বলেননি ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে কি না ?

—বলেছেন দেখা হয়নি। সে জন্যই চিন্তা হচ্ছে।

কর্নেলের আপার্টমেণ্টে ফিরে দেখি ডঃ সুন্দরম আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। মুখে প্রগাঢ় উদ্বেগের ছাপ। বললেন—অসময়ে আবার আপনাকে বিব্রত করায় দুঃখিত কর্নেল সরকার! কিন্তু আমাকে ছুটে আসতেই হল।

কর্নেল বললেন—কী হয়েছে ডঃ সুন্দরম ?

—অফিসে ফিরে শুনলাম বনানী হঠাৎ ছুটি নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু সেজন্য আমার ছুটে আসার কারণ ছিল না। প্রসাদজি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি যোগীন্দ্র শর্মাকে পুলিশ খুঁজতে এসেছিল। শর্মা নাকি গতকাল বোম্বে গেছেন। কেন পুলিশ তাকে খুঁজছে প্রসাদজি বুঝতে পারছেন না। তাই জিজ্ঞেস করলেন আমি এ বিষয়ে কিছু জানি কি না।

—আপনি কী বললেন ?

—আমি বললাম, পুলিশ শর্মাজিকে কেন খুঁজছে আমি জানি না। খন প্রসাদজি আমাকে চার্জ করলেন, আমিই পুলিশকে তার

পিছনে লাগিয়েছি কি না ? ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, শর্মাজির সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা থাকার কারণ নেই। কিন্তু ওঁর সন্দেহ ঘোচাতে পারলাম না। উনি বললেন, শর্মাজি না ফেরা পর্যন্ত আমি যেন ডেটা রিসার্চ সেকশনে না ঢুকি।

—তারপর ?

—আমাকে অফিস থেকে চলে যেতে বললেন। শর্মাজি ফিরে আসার পর আমাকে দরকার হলে ডেকে পাঠাবেন। খুবই অপমানজনক ব্যাপার। ডি আর সেকশনে আমার ব্রিফকেস ছিল। আমার সঙ্গে গিয়ে শুধু ব্রিফকেসটা নিতে দিলেন। ড্রয়ারে ব্যক্তিগত কাগজপত্র ছিল। সেগুলো কিছুই নিতে দিলেন না। ডঃ সুন্দরম রুমালে মুখ মুছে ফের বললেন—ইন্দ্রজিতের কোড নাম্বারটা কম্পিউটারে অ্যানালিসিসের সুযোগ পেলাম না। এটাই আমার প্রচণ্ড ক্ষতি। সেই এজেন্টের নাম-ঠিকানা অজানা থেকে গেল। আমার পাওনাকড়ির সুরাহা কী ভাবে হবে বুঝতে পারছি না।

কর্নেল চোখ বুজে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে কথা শুনছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম—প্রসাদজির এজেন্সির কম্পিউটারে যে এই কোড নাম্বারের ডেটা ফিড করানো আছে তা কীভাবে বুঝলেন ডঃ সুন্দরম ?

ডঃ সুন্দরম বিষণ্ণমুখে বললেন—এজেন্সির একটা মাদার কম্পিউটার আছে। তার সাহায্যে যে কোনও কোড নাম্বারের ডেটা অ্যানালিসিস করা যায়। তবে বলা দরকার, মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সির সঙ্গে যে-সব এজেন্সির সম্পর্ক আছে, শুধু তাদের সম্পর্কেই তথ্য পাওয়া যায়। ইন্দ্রজিৎ জানত, সে যে কোড নাম্বার দিচ্ছে, প্রসাদজির এজেন্সির মাদার কম্পিউটার থেকে তার ডেটা পাওয়া যাবে। তা না হলে এই কোড নাম্বার সে দেবে কেন ? যাই হোক, আমি কর্নেল সরকারকে জানাতে এসেছি, কলকাতার সেই এজেন্সির নামঠিকানা আপনার কথামতো আপাতত দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

কর্নেল চোখ খুলে ঘড়ি দেখলেন। তারপর বললেন—নামঠিকানা আমার আর দরকার হবে না ডঃ সুন্দরম।

ডঃ সুন্দরম একটু ইতস্তত করে বললেন—আপনি কি কোনও সূত্রে

তার নামঠিকানা জানতে পেরেছেন ?
—নাহ্। শুধু এটুকু বলতে পারি, ওটা আমার আর দরকার নেই। ডঃ সুন্দরম উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বনানী আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারত। কিন্তু সে কেন হঠাৎ অফিস থেকে ছুটি নিয়ে গেল বুঝতে পারছি না। আচ্ছা কর্নেল সরকার, আপনার সঙ্গে আজ বনানী যোগাযোগ করেনি ?
কর্নেল দাড়ি নেড়ে ফের বললেন—নাহ্।
উদ্বিগ্নমুখে ডঃ সুন্দরম বেরিয়ে গেলেন। বললাম—কর্নেল। আপনি ডঃ সুন্দরমের সহযোগিতা দরকার বলেছিলেন। কিন্তু এখন মনে হল, বেচারাকে আপনি পাত্তা দিতে চান না।
—আমার আর ওঁর সহযোগিতার দরকার হবে না। বলে কর্নেল হাঁকলেন—ষষ্ঠী! খিদে পেয়েছে।…খাওয়ার পর কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে কর্নেল বললেন—চলো, বেরুনো যাক।
জিজ্ঞেস করলাম—আবার কোথায় বেরুবেন ?
—মিমিদের বাড়ি। তবে তোমার গাড়িতে নয়। ট্যাক্সি করে যাব।
—গাড়ি থাকতে ট্যাক্সি করে কেন ?
—গৌর অফিস থেকে ফিরে তোমার গাড়ি দেখে জানুক, আমি মিমিদের বাড়িতে আছি, এটা আমি চাই না। তাছাড়া সে অফিস থেকে ফেরার আগেই মিমিদের বাড়ি আমার যাওয়া দরকার। সওয়া তিনটে বাজে। উঠে পড়ো।
ট্যাক্সি করে মিমিদের বাড়ি পৌঁছুতে দেরি হল না। কর্নেল মধুকে ডাকার আগেই সে দৌড়ে এসে গেটের তালা খুলে দিল। তারপর চাপা গলায় বলল—কর্তামশাইয়ের কাছে দুপুরবেলা এক সায়েব এসেছিলেন। কী সব কথাবার্তা হল বুঝতে পারিনি। কিন্তু সায়েব চলে যাওয়ার পর কর্তামশাই মিমিদিকে খুব বকাবকি করছিলেন।
কর্নেল বললেন—আর কোনও খবর আছে ?
মধু চাপা গলায় বলল—আপনি তো জানেন কাল সন্ধ্যাবেলায় আবার চোর ঢুকেছিল। বস্তির একটা লোক আজ আমাকে চুপিচুপি বলেছে, চোর পালানোর সময় তাকে সে চিনতে পেরেছে। পাড়ারই একটা ছেলে স্যার! আমার খুব অবাক লাগছে। মিমিদির সঙ্গে

তার ভাব আছে। তবে কর্তামশাইয়ের ভয়ে সে বাড়ি ঢুকতে পারে না এই যা।

—তুমি গৌরের কথা বলছ কি?

মধু অবাক হল।—আপনি চেনেন ওকে? পাড়ার নামকরা গুণ্ডা গৌর। ভাল বংশের ছেলে। লেখাপড়াও জানে। কিন্তু পাজির পাঝাড়া। আমার মনে হচ্ছে, কর্তামশাইয়ের ভয়ে চুপিচুপি সন্ধ্যাবেলা গৌর বাড়ি ঢোকে। মিমিদির সঙ্গে বাগানে ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে ভাব-ভালবাসার কথা বলতে আসে। অ্যাদ্দিন আমার চোখে পড়েনি। ইন্দ্রদাদাবাবু খুন হওয়ার পর নজর রাখছি বলেই চোখে পড়েছে।

কর্নেল বললেন—তুমি মিমিকে কি বলেছ যে, চোরকে তুমি চিনতে পেরেছ?

মধু ভয় পাওয়া মুখে বলল—ওরে বাবা! মিমিদি গৌরকে বলে দিলে সে আমার পেছনে লাগবে। গৌর ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারে স্যার!

মধু আমাদের দোতলায় নিয়ে গেল। মিমিকে দেখতে পেলাম না কোথাও। পরমেশ কর্নেলকে দেখে গম্ভীর মুখে বললেন—আপনার কথাই ভাবছিলাম। আপনার আসার কথা সন্ধ্যা ছটায়। আগে এসে ভালই করেছেন। বসুন, সব বলছি।

আমরা বসলাম। কর্নেল বললেন—মধুর কাছে শুনলাম একজন সায়েব এসেছিলেন! কী ব্যাপার?

পরমেশ উত্তেজিত ভাবে বললেন—ভারী অদ্ভুত ব্যাপার! সায়েবের নাম রবার্ট স্টিলার। সে এসে বলল, ইন্দ্রজিতের সঙ্গে গাল্ফ এরিয়ায় তার খুব চেনাজানা ছিল। যুদ্ধের হিড়িকে ইন্দ্রজিৎ পালিয়ে আসার আগে স্টিলারকে নাকি বলেছিল, মার্চের শেষাশেষি যেভাবে হোক, সে কলকাতায় ফিরবে। এই বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিল। স্টিলার যদি কলকাতা যায়, তার সঙ্গে এই ঠিকানায় যেন যোগাযোগ করে। তাই সে এসেছে। তখন আমি ইন্দ্রজিতের খুন হওয়ার কথা বললাম। সরল বিশ্বাসেই বললাম। শোনার পর লোকটা প্রথমে খুব পস্তাল। তারপর হঠাৎ চাপা গলায় বলল,

ইন্দ্রজিৎ গালফ থেকে প্রচুর জুয়েলস পাচার করে আনবে বলেছিল। সেগুলো পুলিশের হাতে পড়েছে কিনা। যদি না পড়ে থাকে, সে সেগুলো কিনবে। আমি চটে গিয়েছিলাম কথাটা শুনে। সোজা বলে দিলাম, আমি এ সব খবর রাখি না। আপনি আসতে পারেন। ব্যাটাচ্ছেলে উঠতে চায় না। আমাকে টাকাকড়ির লোভ দেখাতে শুরু করল। তখন আমি ওকে ধমক দিয়ে বললাম, এখনই চলে না গেলে পুলিশে খবর দেব। সেইসময় মিমি ফোঁপরদালালি করে বলে উঠল, ইন্দ্রজিতের জুয়েলস এই বাড়িতেই কোথাও লুকোনো আছে। খুঁজে বের করে সায়েবকে বেচে দেওয়া উচিত। নইলে আবার কী বিপদ হতে পারে।

পরমেশের ফর্সামুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছিল। কর্নেল একটু হেসে বললেন—কথাটা মিমি বাংলায় না ইংরেজিতে বলেছিল?

—বাংলায়। সাহেব হয়তো বুঝতে পারেনি। তবে মুখ দেখে মনে হল সন্দেহ জেগেছে। সে মিমির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। আমি ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলাম। সায়েব নির্লজ্জের মতো হাসতে হাসতে চলে গেল।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন—সায়েব কোথায় উঠেছে বলেনি?

পরমেশ মাথা নাড়লেন।—আমি জিজ্ঞেস করিনি কিছু। লোকটাকে দেখেই আমার অপছন্দ হয়েছিল। তাছাড়া ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যার চেনাজানা, সে কেমন মানুষ তা বুঝতে দেরি হয় না।

—মিমি কোথায়?

—কে জানে! রাগ করে কোথায় বসে আছে নির্বোধ মেয়ে!

—ওকে ডাকুন!

পরমেশ গলা চড়িয়ে ডাকলেন।—মিমি! এখানে আয়। কর্নেল সায়েব এসেছেন।

মিমি বারান্দায় ছিল। দরজায় এসে দাঁড়াল। ম্রিয়মান চেহারা। কর্নেল বললেন—ভেতরে এস মিমি! তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।

মিমি ঘরে ঢুকে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল। তারপর আস্তে বলল—জ্যাঠামশাই আমাকে ভুল বুঝছেন। কিন্তু আমি

কিছু ভুল বলিনি। আমার ধারণা, চোরাই জুয়েলস ইন্দ্রদা এ এ বাড়িতেই লুকিয়ে রেখেছিল। এখনও তা কোথাও লুকোনো আছে।......

মিমির দিকে তীক্ষ্ন দৃষ্টে তাকিয়ে কর্নেল বললেন—তোমার কেন মনে হচ্ছে চোরাই মুক্তা এখনও এ বাড়িতে কোথাও লুকোনো আছে?

মিমি আস্তে বলল—গৌরদা আমাকে বলেছে।

পরমেশ রুষ্ট মুখে বললেন—সায়েব চলে যাওয়ার পর মধুকে নিয়ে তোকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে বললাম। কৈ? কোথায় চোরাই মুক্তো? পেলি খুঁজে? ওই বখাটে ছেলেটার কথা বিশ্বাস করি না।

মিমি চুপ করে থাকল।

কর্নেল বললেন—মিমি! গৌর কবে তোমাকে এ কথা বলেছে?

—আজ সকালে।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—আচ্ছা মিমি! তুমি কি জানো সন্ধ্যাবেলায় এ বাড়িতে যে চোর ঢোকে, সে আর কেউ নয়—গৌর?

পরমেশ চমকে উঠলেন—বলেন কী!

মিমি কেমন চোখে তাকিয়ে রইল। আমার মনে হল ওর দৃষ্টিটা বড় রহস্যময়।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। গৌর পর-পর দুদিন সন্ধ্যাবেলায় এ বাড়িতে ঢুকেছিল।

পরমেশ ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বললেন—বুঝেছি। ইন্দ্রের চোরাই মাল হাতানোর জন্যই ঢুকেছিল হারামজাদা। ওসব ছেলেছোকরাকে আমি বাড়িতে ঢুকতে দিই না। দেখা যাচ্ছে, আমি ঠিক ডিসিশন নিয়েছিলাম।

—পরমেশবাবু! চোরাই মুক্তোর খোঁজে সন্ধ্যাবেলায় গৌরের চুপিচুপি এ বাড়িতে ঢোকাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সত্যিই তেমন উদ্দেশ্য থাকলে সে গভীর রাতে হানা দিত। কর্নেল চুরুট ধরিয়ে একটু হাসলেন।—আসলে আমাকে ধোকায় ফেলার জন্য গৌর কারও হুকুম তামিল করেছে। আজ সকালে মিমিকে যে এ বাড়িতে

এখনও চোরাই মুক্তো থাকার কথা বলেছে, তাও একটা চালাকি। গৌর বা তার মালিক জানে মিমি কথাটা আপনাকে বলবে। আপনি আমাকে বলবেন। মিমিও বলবে। এতে আমি বিভ্রান্ত হব। কিন্তু না। আমাকে বিভ্রান্ত করা অত সহজ নয়। অন্তত বরাবর বিভ্রান্ত রাখা সহজ নয়।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। বললাম—তাহলে এ বাড়িতে জিনিসটা লুকোনো নেই বলতে চান?

—নাহ্।

—কিন্তু আপনি বরাবর বলে আসছেন জিনিসটা এখনও এ বাড়িতে কোথাও আছে?

—স্বীকার করছি আমি সত্যি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। এ বাড়িতে আজ ঢোকার সময় বিভ্রান্তি ঘুচে গেছে।

—মধুর কথা শুনে নিশ্চয়?

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে আমার দিকে তাকালেন। পরমেশ জিজ্ঞেস করলেন—মধুর কথায় মানে? কী বলেছে মধু?

কর্নেল হাসলেন।—বস্তির কে নাকি ওকে বলেছে গৌরকে পালাতে দেখেছিল। ছেড়ে দিন। বলে উনি মিমির দিকে তাকালেন।—মিমি, তোমার কাছে যা জানতে এসেছি, এবার বলি। আশা করি সঠিক জবাব দেবে।

মিমিকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। সে মুখ নামিয়ে বলল—বলুন।

কর্নেল পকেট থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ বের করলেন। দেখলাম আমার কুড়িয়ে পাওয়া সেই চিঠিটা। সেটা দেখিয়ে বললেন—তুমিই এটা সেদিন আমার চোখে পড়ার মতো জায়গায় ফেলে রেখেছিলে। তাই না?

মিমি আস্তে মাথাটা দোলাল। পরমেশ বললেন—কী ওটা?

কর্নেল ওঁকে চিঠিটা দেখতে দিয়ে বললেন—মিমি! এটা কোথায় পেয়েছিলে?

মিমি বলল—ইন্দ্রদার বালিশের তলায়।

—বালিশ তুলেছিলে কেন?

—এমনি।

—নাহ্। তখন বালিশ তুলে দেখার মতো তোমার মনের অবস্থা ছিল না। কেউ কি তোমাকে বলেছিল কিছু খুঁজে দেখতে ? বলো মিমি ! এটা আমার জানা খুব দরকার।

মিমি একটু ইতস্তত করে বলল—গৌরদা বলেছিল ইন্দ্রদার কাছে একটা বেনামি চিঠি আছে। সেটা খুঁজে বের করে ওকে যেন দিই। কিন্তু আমি ওকে দিইনি। জ্যাঠামশাইয়ের কাছে আপনার পরিচয় পাওয়ার পর ওটা যাতে আপনার হাতে যায়—

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন—তুমি সরাসরি আমার হাতে দিতে পারতে।

মিমি বিব্রতভাবে বলল—আমি ভয়ে আপনাকে দিতে পারিনি।

—কিসের ভয় ?

—তখনও আমি আপনাকে ভালো করে চিনতাম না। ভেবেছিলাম আপনি পুলিশকে বলে আমাকে জড়াবেন। গৌরদার কথাটা পুলিশকে বলতে আমি বাধ্য হব। গৌরদা রেগে যাবে। এ সব কারণে ওভাবে ঝোপের নীচে রেখেছিলাম।

—আমার সঙ্গে বাগানে যাওয়ার সময় ?

—হ্যাঁ খিড়কির দিকে যাওয়ার পথের ধারে চুপিচুপি ফেলে দিয়েছিলাম।

পরমেশ চিঠিটা কর্নেলকে ফেরত দিয়ে বললেন—ভাইটাল ক্লু। খুনির হাতের লেখা। তার চেয়ে বড় কথা, হারামজাদা গৌরও এর সঙ্গে জড়িত। ওকে এখনই পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিন কর্নেলসায়েব !

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—পুলিশ ওর দিকে নজর রেখেছে। আমি উঠি পরমেশবাবু।

পরমেশ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কফি না খেয়ে চলে যাবেন কী ! মিমি !

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—না। একটু তাড়া আছে। একটা কথা। রবার্ট স্টিলার তাঁর নেমকার্ড দিয়ে যান নি ?

পরমেশ গম্ভীর মুখে বললেন—দিয়েছিল। আমি ফেলে দিয়েছিলাম। মিমি ! খুঁজে দ্যাখ্ তো এখানেই কোথাও পড়ে আছে।

মিমি কার্ডটা অনেক খুঁজে কুড়িয়ে আনল। একটু তফাতে আলমারির তলায় পড়ে ছিল সেটা। কর্নেল কার্ডটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। মিমি ঘরেই দাঁড়িয়ে রইল। ওর মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। গৌর ওর প্রেমিক। সেই প্রেমিকের প্রতি এবার সম্ভবত ভয় জেগেছে।

নীচে হলঘরের দরজায় মধু দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল তাকে বললেন—মধু! আমরা খিড়কির দরজা দিয়ে বেরুব। এস। ওদিকটা খুলে দেবে।

মধু অবাক হয়ে বলল—ওদিকে নোংরা আছে স্যার!

—তা হোক। এস।

খিড়কির দরজার বাইরে আবর্জনার গাদা। তারপর বস্তি এলাকা। আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে হেঁটে মোটামুটি চওড়া রাস্তায় পেঁছিলাম। ততক্ষণে রাস্তার আলো জ্বলে উঠেছে। এণ্টালি মার্কেটের সামনে কর্নেল বললেন—চলো।

ট্রামেই ফেরা যাক। বাসে চাপা এখন অসম্ভব। ট্যাক্সিও পাওয়ার আশা কম।

কর্নেলের অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরলে ষষ্ঠীচরণ বলল—এক্ষুণি একটা ফোং এয়েছিল বাবামশাই! কী যেন নাম বললেন। পেটে আসছে, মুখে আসছে না। তবে আবার ফোং করবেন বলেছেন।

ষষ্ঠী ফোনকে 'ফোং' বলে। কর্নেল কপট হুংকার দিয়ে বললেন—কফি!

সে ভেতরে চলে গেল। কর্নেল তাঁর ইজিচেয়ারে বসে চোখ বুজে দাড়িতে হাত বুলোতে থাকলেন। বললাম—রবার্ট স্টিলার কোথায় উঠেছেন জেনে আসা উচিত ছিল, কর্নেল!

কর্নেল বললেন—কার্ডে লিখে দিয়ে গেছেন। প্রসাদজির চেনাজানা হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া হোটেল কণ্টিনেণ্টালেই উঠেছেন। কফি খেয়ে ব্রেন চাঙ্গা করা যাক। তারপর ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করতে যাব।

কথাটা শুনে অস্বস্তি হচ্ছিল। রবার্ট স্টিলার নিশ্চয় ইউরোপের কোনও দেশের গুপ্তচর। গুপ্তচরেরা খুব সাংঘাতিক লোক হয়।

তার সঙ্গে এভাবে সন্ধ্যায় দেখা করতে যাওয়া কি উচিত হচ্ছে কর্নেলের ?

প্রশ্নটা তুলতে যাচ্ছি, ফোন বাজল। কর্নেল ফোন তুলে সাড়া দিয়ে বললেন—হ্যাঁ বলুন যতীনবাবু।...একটু বেরিয়েছিলাম।...তাই বুঝি ?...হ্যাঁ। ভাল করেছেন। আচ্ছা, রাখছি। সাবধানে থাকবেন।

জিজ্ঞেস করলাম—যতীনবাবুর ফোন ?

—হ্যাঁ বনানীর অফিসের এক ভদ্রলোক দেখা করতে গিয়েছিলেন। যতীনবাবু দরজার ফাঁক দিয়ে কথা বলেছেন। ভেতরে ঢোকাননি।

—নাম বলেন নি ভদ্রলোক ?

কর্নেল হাসলেন।—নাম না বললেও অনুমান করছি ডঃ সুন্দরম বনানীর খোঁজে গিয়েছিলেন।

—বনানী ফরাক্কা গেছে বলেছেন নাকি যতীনবাবু ?

—হ্যাঁ। ডঃ সুন্দরম ফরাক্কায় ছুটে যেতেও পারেন। যান্ না। ক্ষতি কী ?

—বনানীকে ওঁর খুব দরকার বলছিলেন তখন। কী দরকার আমার মাথায় আসছে না।

ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। কর্নেল চুপচাপ কফিতে মন দিলেন। কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে উনি উঠে দাঁড়ালেন।—এবার তোমার গাড়িতে যাব ডার্লিং! বলে একটু হাসলেন।—তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে অস্বস্তি হচ্ছে। অস্বস্তির কারণ নেই জয়ন্ত। হোটেল কণ্টিনেণ্টালে পুলিশ নজর রেখেছে গত দুদিন থেকে। উঠে পড়ো!...

হোটেল কণ্টিনেণ্টালের উল্টোদিকে একটা পার্ক। পার্কের শেষপ্রান্তে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন কর্নেল। কিন্তু গাড়ি থেকে নামলেন না। হোটেলের সামনে প্রশস্ত লন উজ্জ্বল আলোয় ঝকমক করছে। এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে লনটা। কর্নেল বাইনোকুলারে সেদিকটা দেখে নিয়ে বললেন—গাড়ি এখানে লক করে রাখো। আমরা হোটেলের সামনে ফুটপাতে ওই গাছটার ছায়ায় দাঁড়াব।

বেরিয়ে গাড়ি লক করে বললাম—রবার্ট স্টিলারের সঙ্গে দেখা করবেন না?

—এস তো!

ঝাঁকড়া গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়ালাম দুজনে। কর্নেলের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছিলাম না। উনি লনের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাঝেমাঝে প্রাইভেটকার বা ট্যাক্সি চেপে সায়েবসুবো এবং দিশি-বিলিতি মেমসায়েব কিংবা শাড়িপরা মহিলারা যাতায়াত করছেন। কিছুক্ষণ পরে একটা সাদা মারুতি হোটেলের লনে ঢুকল। তারপর সেই গাড়ি থেকে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা বেরুলেন। তাঁরা ডাইনে ঘুরে হোটেলের সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতেই ভীষণ চমকে উঠলাম।—এ কী কর্নেল!

কর্নেল আস্তে বললেন—হ্যাঁ। বনানীকে আমিও দেখার আশা করিনি। অবশ্য আমার সন্দেহ ছিল, ও সত্যিই আমার কথামতো ফরাক্কা যাবে কি না।

—ওর সঙ্গের দাড়িওলা লোকটি কে?

কর্নেল দ্রুত বাইনোকুলার তুলে চোখে রাখলেন। কিন্তু ততক্ষণে বনানী ও তার সঙ্গী ভেতরে ঢুকে গেছে। বাইনোকুলার নামিয়ে কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন—তুমি অপেক্ষা করো। আমি দেখি এখানে কোনও দোকানে টেলিফোন করা যায় কি না। ওই ওষুধের দোকানটায় নিশ্চয় টেলিফোন আছে। লক্ষ্য রেখো চেনা কেউ ঢুকছে বা বেরুচ্ছে কি না।

কর্নেল হন্তদন্ত রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের ওষুধের দোকানে গিয়ে ঢুকলেন।

চেনা কোনও লোককে আর হোটেলের লনে দেখতে পেলাম না। মিনিট কয়েক পরে কর্নেল ফিরে এসে বললেন—কুইক জয়ন্ত! এখান থেকে সোজা শ্যামপুকুরে যতীনবাবুর বাড়ি যাব।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কাকে ফোন করলেন?

—ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়িকে ফোন করার চেষ্টা করলাম। পেলাম না। পরে কোথাও চেষ্টা করব।

—কী ব্যাপার?

—ব্যাপার পরে। এখন যতীনবাবুর বাড়ি। সোজা রাস্তায় জ্যামে পড়বে। বরং ডাইনের ওই গলি রাস্তা দিয়ে চলো। তারপর আমি শর্টকাট বাতলাব। কলকাতার নাড়িনক্ষত্র আমার জানা।

যতীনবাবুর বাড়ি পেঁছিতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে গেল। গাড়ি আগের জায়গায় পার্ক করে রেখে বেরুলাম। কর্নেল ব্যস্তভাবে হাঁটছিলেন। দোতলায় যতীনবাবুর ফ্ল্যাটে বোতাম টেপার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দরজা ফাঁক হল এবং যতীনবাবু আমাদের দেখে তখনকার মতো চমকে উঠলেন।

কর্নেল বললেন—আপনি আমাকে ফোন করার পর বনানী এসেছিল?

যতীনবাবু দরজা পুরো খুলে বললেন—না তো। আসুন!

ভেতরে ঢুকে কর্নেল বললেন—আপনার এবং আপনার মেয়ের মঙ্গলের জন্য একটা অনুরোধ করছি।

—বলুন!

—বনানীর ঘরটা আমি একবার দেখতে চাই। এখন কোনও প্রশ্ন করবেন না প্লিজ! হাতে সময় নেই। যতীনবাবু উদ্বিগ্নমুখে বললেন– আসুন।

বাঁদিকে একটা ঘরের দরজার পর্দা তুলে যতীনবাবু বললেন—এ কী ব্যাপার? তালা আঁটা কেন?

কর্নেল হাসলেন।—আপনি মেয়েকে সত্যি ভয় পান এবং এড়িয়ে চলেন। তাই হয় তো লক্ষ্য করেন নি। এ ঘরে গত সোমবার মানে ইন্দ্রজিৎ খুন হওয়ার পরদিন থেকে তালা আঁটা থাকে। আজ দুপুরে ফ্যানের হাওয়ায় পর্দা সরে-সরে যাচ্ছিল। তখন আমার তালাটা চোখে পড়েছিল। যাই হোক, আমার কাছে মাস্টার কী আছে। তালা খুলতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু তার আগে বলুন, এ ঘরের দেয়ালে মরুভূমির কোনও ছবি আছে কি?

—আছে দেখেছি। ইন্দ্রজিৎ দিয়ে গিয়েছিল।

কর্নেল পকেট থেকে একটা চাবির গোছা বের করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তালাটা খুলে ফেললেন। তারপর ঘরে ঢুকে গেলেন। যতীনবাবুও ঢুকলেন। আমি দরজার ফাঁকে উঁকি দিলাম।

দেখলাম, কর্নেল দেয়াল থেকে একটা মাঝারি সাইজের ফ্রেমে বাঁধানো মরুভূমির ছবি খুলে নিলেন। তারপর বললেন—এটা নিয়ে যাচ্ছি। বনানী এসে জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আমি নিয়ে গেছি।

যতীনবাবু হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল ছবিটা বগলদাবা করে বেরুলেন। রাস্তায় নেমে বললেন—কুইক জয়ন্ত! যে-কোনও মুহূর্তে ওরা এসে পড়তে পারে।...

দশ

এযাবৎ আমার এই বৃদ্ধ রহস্যভেদী বন্ধুর অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ দেখে আসছি। কিন্তু আজ যা করলেন, তার কোনও মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বনানীর ঘরে একটা মরুভূমির ছবি আছে, তাই বা কেমন করে জানলেন এবং সেটা হঠাৎ এভাবে কেনই বা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চলে এলেন? তা ছাড়া কী আছে এই ছবিটাতে? অসংখ্য প্রশ্ন আমাকে উত্যক্ত করছিল। কিন্তু আমাকে সারা পথ চুপ করিয়ে রাখল কর্নেলের প্রগাঢ় স্তব্ধতা। চোখ বন্ধ করে উনি যেন ধ্যানমগ্ন দাঁতের ফাঁকে আটকানো চুরুটটাও নিভে গেছে।

ওঁর অ্যাপার্টমেণ্টে ফিরে একটু ধাতস্থ হলাম। ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা উনি ভেতরের ঘরে রেখে এলেন। তারপর যথারীতি ষষ্ঠীচরণকে আবার কফির হুকুম দিলেন। টেলিফোনে কার সঙ্গে চাপা গলায় কিছুক্ষণ কী সব কথাবার্তা বললেন। তারপর আমার দিকে সহাস্যে তাকালেন। আর একটু দেরি করলেই সব ভেস্তে যেত। আসলে বয়স ডার্লিং, বয়স! আমার বয়স আমাকে বাহাত্তুরে দশার ফাঁদে ফেলবার তালে আছে। আমার নিজেরই অবাক লাগছে নিজের বোকামি দেখে! কেন যে এটা কাল সন্ধ্যায় আমার মাথায় আসেনি! আজও আসত না, যদি না হোটেল কণ্টিনেণ্টালের লনে বনানীকে দেখতে পেতাম।

আস্তে বললাম—আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

—বনানীরও প্রথমে মাথায় ঢোকেনি, তা এখন বুঝতে পারছি।

আমি ওকে আজ সকালে বাইরে চলে যেতে বললাম। তারপর নিশ্চয় ও রহস্যটা আঁচ করেছিল। কারণ আজ অফিসে রবার্ট স্টিলারের সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল। স্টিলার—হ্যাঁ, স্টিলার ওকে বলে থাকবে মরুভূমির ছবিটার কথা। অমনি বনানী বুঝতে পারে, তার কাছে কী আছে এবং সেটার কত দাম। কিন্তু একা স্টিলারের সঙ্গে ডিলে নামতে সাহস পায়নি। একজন বিশ্বস্ত পুরুষ সঙ্গীর সাহায্য দরকার হয়েছিল। তাকেই তুমি কিছুক্ষণ আগে বনানীর সঙ্গে দেখেছ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি ছদ্মবেশী ডঃ সুন্দরমকেই দেখেছ। দরাদরি শেষ করে এতক্ষণ তিনজনে যতীনবাবুর বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছে সম্ভবত। আশা করছি, যতীনবাবু ফোনে জানাবেন কী হল।
ষষ্ঠী কফি দিয়ে গেল। কর্নেল চুমুক দিয়ে বসলেন ফের—ডঃ সুন্দরম যখন আজ প্রথমবার আমার কাছে এলেন, তখন বনানী তাঁকে অফিসে না পেয়ে তাঁর বাড়ি গিয়ে থাকবে। বাড়িতে না পেয়ে ফের অফিসে সে ডঃ সুন্দরমের খোঁজে এসেছিল। মহাবীর ট্রেডিং এজেন্সিতে পুলিশ গোপনে নজর রেখেছে। এইমাত্র টেলিফোনে জেনে নিলাম, বনানী আবার গিয়েছিল অফিসে। আমার পুলিশসোর্স বলল, বনানী প্রথমবার অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার সময় এক সায়েব তার সঙ্গে কথা বলেছিল। যাই হোক, দ্বিতীয়বার ডঃ সুন্দরমের খোঁজে এসে বনানী নিশ্চয় জানতে পারে প্রসাদজি তাঁকে ভাগিয়ে দিয়েছেন। তখন সে তাঁর বাড়িতে যায়। ক্লিয়ার?
বললাম—হ্যাঁ। কিন্তু মরুভূমির ছবির ব্যাপারটা কী?
কর্নেল হাসলেন।—ছবিটার ভেতরে ভাঁজ করা সেই সাংঘাতিক ম্যাপ আছে।
—কিন্তু আপনি কী করে তা জানলেন?
কর্নেল ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন—কাল সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশন থেকে বনানীর অফিসে আমার যাওয়ার কারণ ছিল। আবার ওকে জেরা করে জানতে চেয়েছিলাম রবিবার রাতে ম্যাজিক শোয়ের পর ঠিক কী কী ঘটেছিল! কথায়-কথায় বনানী বলল, শো ভাঙার

সময় ইন্দ্রজিৎ কাগজে মোড়া একটা ছবি ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলে, এটা একটা মরুভূমির সুন্দর ছবি। তুমি ঘরে টাঙিয়ে রেখো। শো ভাঙার পর সে ভিড়ে নিপাত্তা হয়ে যায়। তার মানে ম্যাপটা সে নিরাপদ জায়গায় রাখার জন্য তড়িঘড়ি এই ব্যবস্থা করেছিল। কারণ সে ফাঁদটা টের পেয়েছিল। এরপর ছবিটা সম্পর্কে আমার কৌতূহল একটু বেশিমাত্রায় দেখিয়ে ভুল করেছিলাম। না—বনানী তখন কী করে জানবে ওটার মধ্যে কী আছে? আমিই বা তখন কী করে জানব ম্যাপের কথা? আমি ওকে শুধু এটুকু বলেছিলাম, ছবিটা সাবধানে রাখতে। কারণ আমার মনে হয়েছিল, তথাকথিত 'চোরাই মুক্তো' লুকিয়ে রাখার কোনও সাংকেতিক সূত্র আছে ছবিটার মধ্যে। বুদ্ধিমতী বনানী তা বিশ্বাস করেছিল। পরে—

ওর কথার ওপর বললাম পরে স্টিলার সায়েব ছবিটার কথা বলেছেন!

—হ্যাঁ। তাই মনে হচ্ছে। তবে বনানীকে স্টিলার ম্যাপের কথা না বলতেও পারেন। শুধু ছবিটা কিনতে চেয়েছিলেন সম্ভবত। কিন্তু ডঃ সুন্দরমকে আমি অদৃশ্য কালিতে লেখা ম্যাপের খবর জানিয়েছি। কাজেই এবার বনানীরও তা জানার চান্স আছে। দরাদরির জোর চলার কথা।

—কিন্তু বনানী তো ভারী অদ্ভুত মেয়ে!

—প্রেমের চেয়ে টাকাকড়ির দাম অনেক বেশি, ডার্লিং! তা ছাড়া তার প্রেমিক তো আর বেঁচে নেই।

—স্বীকার করছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে এরকম ব্যবহার করল, এটাই খারাপ লাগছে।

কর্নেল চকিতে শেষ চুমুক দিয়ে চুরুট ধরিয়ে বললেন—ভুল করছ জয়ন্ত! বনানী আমার কাছে এসেছিল তার প্রেমিকের খুনীকে ধরিয়ে দিতে। বাকিটা তার নিজের ব্যাপার।

—খুনীদের একজন যে গৌর, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

—হ্যাঁ। গৌর ছিল দলে। সে-রাতে মিমির ঘুম হচ্ছিল না এবং বাইরে অনেক রাত পর্যন্ত বসে ছিল। তার সোজা মানে দাঁড়াচ্ছে, গৌরকে মিমিই খিড়কির দরজা খুলে দিয়েছিল। গৌর এবং তার

সঙ্গীরা বাড়ি ঢোকে। মিমি কিন্তু জানত না তারা খুন করতে এসেছে ইন্দ্রজিৎকে। চোরাই মুক্তোর লোভেই তারা অবশ্য এসেছিল। খুন করে খুঁজে না পেয়ে চলে যায়। ব্যস্ততার সময় চিঠিটার কথা ভুলে গিয়েছিল তারা।

—মিমি খুব বোকা মেয়ে!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—প্রেম মানুষকে নির্বোধ করে। যাই হোক, আমরা শিগগির ডিনার খেয়ে বেরুব।

—আবার কোথায় বেরুবেন?

—হাওড়া স্টেশন।

—সে কী!

—রাত দশটা নাগাদ ভায়া আসানসোল গয়ার ট্রেন ছাড়ে। আমরা চোরডিহা যাব।

—সর্বনাশ!

—সর্বনাশ বৈকি! হালদার মশাই নিশ্চয় বিপদে পড়েছেন। আমার ভাবনা হচ্ছে। তা ছাড়া জঙ্গলের সেই বজরঙ্গবলীর মন্দিরে কুঞ্জনাথবাবুরা কী অবস্থায় আছেন, দেখা দরকার।

—হরনাথবাবুকে ছেড়ে দিল কি না কলকাতায় বসেই তো খবর পাবেন। আর হালদারমশাই বিচক্ষণ গোয়েন্দা। প্রাক্তন পুলিশ অফিসার বলে কথা!

কর্নেল বললেন—নাহ্। হালদার মশাইয়ের কাছে আমিই শেখসাহেব আর হরনাথবাবুকে পাঠিয়েছিলাম। কাজেই তাঁর কিছু বিপদআপদ হলে আমার তাঁকে বাঁচানো নৈতিক কর্তব্য।

উনি ষষ্ঠীকে ডেকে নটার মধ্যেই খাওয়ার টেবিল সাজাতে বললেন। আমি বললাম—কিন্তু কর্নেল! বাইরে যাওয়ার জন্য আমার তো তৈরি হওয়া দরকার।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। খেয়ে দেয়ে তোমার সঙ্গে তোমার সল্টলেকের ফ্ল্যাটে যাব। ওখান থেকে হাওড়া স্টেশন যাব।

—ওখান থেকে ট্যাক্সি পাওয়া যাবে না অত রাতে। আমার কোনও ড্রাইভারও নেই যে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন।—চিন্তার কারণ নেই। পুলিশের জিপের ব্যবস্থা করছি। বলে উনি তৈরি হওয়ার জন্য ভেতরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমরা খেতে বসেছি, ডোরবেল বাজল। কর্নেল চাপা স্বরে বললেন —ষষ্ঠী! যে-ই হোক গিয়ে বলে আয়, আমি বাড়ি নেই। বাইরে গেছি। কবে ফিরব ঠিক নেই। সাবধান! ভেতরে ঢোকাবিনে।

ষষ্ঠী চলে গেল। বললাম—যদি ডি সি ডি ডি বা কোনও ভি আই পি হন?

কর্নেল বললেন—খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই।

একটু পরে ষষ্ঠীচরণ এসে একগাল হেসে বলল—একজন সায়েবও ছিলেন, বাবামশাই! সঙ্গে সেই দিদিমণি আর সেই ভদ্দলোক। দুপুরবেলা যিনি এয়েছিলেন।

—হুঁ। ডঃ সুন্দরম, বনানী, রবার্ট স্টিলার। কী বললেন ওঁরা?

ষষ্ঠী একটা নেমকার্ড দিয়ে বলল—ফিরে এলে আপনাকে এটা দিতে বললেন।

কার্ডটা দেখে কর্নেল রেখে দিলেন টেবিলে। দেখলাম, রবার্ট স্টিলারের কার্ড। পাশে ইংরেজিতে লেখা আছে, 'দয়া করে এই ফোন নম্বরে আমার সঙ্গে কথা বলবেন।'

বললাম—আপনার বরাত খুলে গেছে কর্নেল! কোটিপতি হয়ে যাবেন। ডঃ সুন্দরম আর বনানীকে কিছু পার্সেন্ট কমিশন দিলেই চলবে।

কর্নেল কোনও কথা বললেন না। খাওয়া শেষ করে কর্নেল টেলিফোনে কার সঙ্গে কথা বললেন তারপর আমরা বেরুলাম। ইস্টার্ন বাইপাসে পৌঁছে বললাম—লাল মারুতিটা এবার ফলো করলে গুলি ছুঁড়ে টায়ার ফাঁসিয়ে দেব কিন্তু!

কর্নেল বললেন—তাকে পাচ্ছ কোথায়?

—কেন? গত রাতে পুলিশ তো গাড়িটা ধরতে পারেনি।

—আজ সকালে গাড়িটা মালিকের বাড়ি ফেরত এসেছে।

—সে কী? খুলে বলুন প্লিজ!

যোগীন্দ্র শর্মা বোম্বে যায় নি। কলকাতাতেই আছে। তার

প্রমাণ সে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে মালিকের বাড়ি পেঁছে দিয়েছে। মালিকের কর্মচারীর কাছে খবরটা পেয়েছি।

—কখন ?

—যতীনবাবুর বাড়ি থেকে দুপুরে ফেরার সময়।

অবাক হয়ে বললাম—তখন তো আপনার সঙ্গে আমি ছিলাম।

—ছিলে।

—কিন্তু কাল কখন আপনি লাল মারুতির কোন মালিকের কাছে গেলেন ?

—তোমার চোখের সামনে।

—আমার চোখের সামনে ? যতীনবাবুর বাড়ি থেকে ফেরার সময় আপনি তো আর কোথাও যান নি।

—চন্দ্র জুয়েলার্সে ঢুকেছিলাম। তাঁদের কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলে এলাম।

চমকে উঠে বললাম—কর্নেল! আপনি কি বলতে চান লাল মারুতিটা······

আমার কথার ওপর কর্নেল বললেন—লাল মারুতিটার মালিক চন্দ্র জুয়েলার্স। শুধু নাম্বার প্লেট চেঞ্জ করা হয়েছিল।

—চন্দ্র জুয়েলার্সের গাড়ি ? তা বলে আমার থিওরি ঠিক। গাড়িটা কুঞ্জনাথবাবুর। কুঞ্জনাথই ম্যাজিকশোয়ের টিকিট দিয়েছিলেন বনানীকে। বনানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ইন্দ্রজিৎকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিলেন। না পেরে যোগীন্দ্রের সঙ্গে চক্রান্ত করে চিঠি লিখে গৌরকে নিয়ে পরমেশবাবুর বাড়ি ঢোকেন।

কর্নেল হাসলেন।—তা হলে গতরাতে কুঞ্জনাথের পুলিশের হাতে ধরা পড়ার কথা। অথচ উনি সঙ্গে টাকা আর পুলিশ নিয়ে চোরডিহা গেছেন।

—কুঞ্জনাথের কোনও লোক ধরা পড়েছে কাল রাতে। সিওর।

কর্নেল আর কোনও কথা বললেন না। সল্টলেকে আমার বাড়ির কাছে পেঁছে দেখি পুলিশের একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল আমাকে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন।—তোমার গাড়ি গ্যারেজে রেখে শিগগির তৈরি হয়ে এস। দেরি কোরো না। আমি জিপে গিয়ে

বসছি।

উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। একটা ছোট স্যুটকেসে পোশাক এবং দরকারি কিছু জিনিস ভরে নিয়ে কয়েকমিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এলাম।

জিপের কাছে যেতেই ডি সি ডি ডি অরিজিৎ লাহিড়ি সম্ভাষণ করলেন—হ্যাল্লো সাংবাদিকমশাই! আপনার কাগজের জন্য অসাধারণ স্টোরি হবে। তাই না?

বললাম—কী ব্যাপার মিঃ লাহিড়ি? আপনিও চোরডিহা যাবেন নাকি?

—নাহ্ ব্রাদার! চোরডিহা আমার এলাকা নয়। আমি শুধু কলকাতা নিয়েই আছি। কলকাতা পুলিশের লোক। আপনাদের স্টেশনে পেঁাছে দিয়েই চলে আসব।

দেখলাম লাহিড়িসায়েব নিজেই ড্রাইভ করে এসেছেন। পেছনে জনাচার পুলিশ বসে আছে। কর্নেলের পাশে ঠাসাঠাসি করে বসলাম। জিপে স্টার্ট দিয়ে লাহিড়ি সায়েব বললেন—বুঝলেন জয়ন্তবাবু? আমার ধারণা, ইন্দ্রজিৎ রায়ের মুখ্য খুনীকে হাওড়া স্টেশনেই পাওয়া যাবে। তাকে ওখানেই অ্যারেস্ট করা যেত। কিন্তু আপনার বৃদ্ধ বন্ধুর তাতে আপত্তি। উনি বলছেন, চোরডিহার জঙ্গলে বজরঙ্গবলীর মন্দিরেই তাকে ধরা হবে। সেখানে সে নাকি চোরের ওপর বাটপারি করতে যাবে।

কর্নেল বললেন—হঁ্যা। তার বড় স্যাঙাত পুলিশ হাজতে। সে ছটফট করছে, টাকা তারই বন্ধু যোগীন্দ্র ব্যাটাচ্ছেলে এই সুযোগে হাতিয়ে নেবে। এমন তো কথা ছিল না। টাকাটা তার হাতেই ফেরত আসার কথা ছিল। নিজেকে নিজেই কিডন্যাপ করে আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে তথাকথিত 'চোরাইমুক্তো' হাতানোর প্ল্যান যে এভাবে ভেস্তে যাবে, সে ভাবতেও পারেনি।

হাঁ করে শুনছিলাম। বললাম—নিজেকে নিজেই কিডন্যাপ! এর মানে?

—কিডন্যাপড কে হয়েছেন জয়ন্ত?

—কেন? হরনাথবাবু!

কর্নেল হাসলেন।—হরনাথ নিজেকে নিজেই কিডন্যাপ করেছিলেন। অবশ্য যোগীন্দ্র এবং গৌরেরা সাহায্যে করেছিলেন। চমৎকার কৌশল বলা চলে। কিন্তু মরিয়া হয়ে তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ফেঁসে গেছেন। জয়ন্ত, গতরাতে মেট্রো সিনেমার সামনে যাকে পাকড়াও করা হয়েছে, তিনি স্বয়ং হরনাথ চন্দ্র!

হতবাক হয়ে বসে রইলাম। কী বলব মাথায় এল না।

কর্নেল বললেন—মিমির ছুঁড়ে ফেলা যে চিঠিটা তুমি কুড়িয়ে পেয়েছিলে, ওটা হরনাথেরই হাতের লেখা। চন্দ্র জুয়েলার্সে গিয়ে ওঁর হাতের লেখা মিলিয়ে নিয়েছি। তবে হরনাথ দশ লক্ষ ডলার দামের জুয়েলের লোভেই এত কাণ্ড করেছেন। আসল ব্যাপারটা উনিও জানতেন না…

ট্রেন ছেড়েছিল তিনঘণ্টা দেরিতে। তাই তত ভিড় ছিল না এই রাতের ট্রেনে। ফার্স্টক্লাস প্রায় ফাঁকাই ছিল। বর্ধমানে পৌঁছুলে ফার্স্ট ক্লাস কোচটা একেবারে সুমসাম নিরিবিলি হয়ে গেল। আমার মনে খালি যোগীন্দ্র শর্মার জন্য আতঙ্ক আর অস্বস্তি। কর্নেল কিন্তু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। একটা ক্যুপে শুধু আমরা দুজন। দরজা ভেতর থেকে আটকে দিয়েছিলাম। প্রতিমুহূর্তে আশঙ্কা করেছিলাম, যোগীন্দ্র বা তার লোকেরা এসে বন্ধ দরজায় শব্দ করবে। তবে অন্য কেউ হলেও দরজা খুলব না সেটা ঠিক করেই ছিলাম।

কিন্তু আসানসোল পেরিয়ে যাওয়ার পরও কেউ দরজায় নক করল না। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি কে জানে। ঘুম ভাঙল কর্নেলের ডাকে। জানালার বাইরে সকালের ঝলমলে রোদ। কর্নেল বললেন—চোরাডিহা এসে গেল। তুমি কী হারালে জানো না জয়ন্ত!

চমকে উঠে বললাম—কী?

কর্নেল হাসলেন।—পাহাড়ি সুড়ঙ্গ। কয়েকটা পাহাড়ের সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এলাম আমরা। তা ছাড়া দুধারে বসন্তকালের ভোরবেলার বনের অলৌকিক সৌন্দর্যও তুমি মিস করেছ।

আমার বৃদ্ধ বন্ধু একজন প্রকৃতিবিদও। বুঝতে পারলাম পাহাড়-

জঙ্গলের আদিম প্রাকৃতিক পরিবেশ ওঁকে মাতিয়ে তুলেছে। এবার শুধু একটাই ভয়। দুর্লভ প্রজাতির পাখি-প্রজাপতি-অর্কিডের খোঁজে আমাকে ফেলে নিপাত্তা হয়ে না যান।

ট্রেনের গতি কমে এসেছিল। কুপ থেকে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়ালাম আমরা। বললাম—যোগীন্দ্র শর্মা সম্ভবত আপনাকে দেখতে পেয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। তাই এ ট্রেনে আসেনি। এলে নিশ্চয় টের পেতাম।

কর্নেল আস্তে বললেন—যোগীন্দ্র চোরডিহারই লোক।

—বলেন কী!

—তার জীবনচরিত জেনে নিয়েছি। আসলে মুক্তিপণের টাকা চোরডিহার জঙ্গলে বজরঙ্গবলীর মন্দিরে পৌঁছে দেওয়ার কথা শুনেই আমার স্বভাবত সন্দেহ হয়েছিল। এটা তার সুপরিচিত জায়গা। তার এখানে লোকজনও থাকা সম্ভব। তাই সে হরনাথের সঙ্গে চক্রান্ত করার সময় এই জায়গাটাই সাজেস্ট করেছিল। হ্যাঁ—হরনাথ একটু বোকামি করে ফেলেছিলেন ওর কথায়। ওর ফাঁদে পড়ে গেলেন।

—কিন্তু হরনাথ ওর ফাঁদে পড়তে গেলেন কেন? নিজেকে নিজে কিডন্যাপ করার কারণ কী?

—পুলিশের জেরায় হরনাথ কবুল করেছেন, ইন্দ্রজিতের সেই চিঠিটা হাতাতে যোগীন্দ্র ওঁকে এই ফিকির বাতলেছিল। বনানী তাঁকে চেনে। মুখে দাড়ি এঁটে এলেও দৈবাৎ যদি চিনতে পারে, তাই কিডন্যাপড হয়ে থাকাই মোক্ষম সুবিধা। বনানীর আপাতদৃষ্টে চেনা ঠেকলেও ধারণা হবে, যে লোকটা কিডন্যাপড হয়েছে, সে কী করে তার হাত থেকে চিঠি নেবে? তার চেয়ে বড় কথা, আমাকেও ধাপ্পা দেওয়া যাবে। আমিও ধরে নেব, হরনাথ সাতেপাঁচে নেই। আফটার অল, হরনাথই তো আমার শরণাপন্ন হয়েছিলেন।

প্ল্যাটফর্মে নেমে কর্নেল এদিক-ওদিক দেখে নিলেন। ভিড় ছিল। ভিড় ঠেলে স্টেশনের বাইরে গিয়ে উনি একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলেন। বললেন—ফরেস্ট বাংলো।

টাউনশিপের বাইরে এবড়োখেবড়ো চড়াই-উৎরাই রাস্তায় ঘোড়ার

গাড়ি ছাড়া কোনও যানবাহন মিলত না। নির্জন জঙ্গলের রাস্তা। দুধারে নানা গড়নের পাথর, টিলা আর ঘন জঙ্গল। বুঝলাম কর্নেল এর আগেও এখানে এসেছেন। চোখে বাইনোকুলার রেখে এদিক-ওদিক দেখছিলেন। কিন্তু আমার মনে দুর্ভাবনা, যে-কোনও মুহূর্তে যোগীন্দ্রের পাল্লায় পড়ব। দলবল নিয়েই হয় তো ঝাঁপিয়ে পড়বে।

তেমন কিছু ঘটল না। একটা টিলার গায়ে সুন্দর বাংলো দেখা যাচ্ছিল। বাংলোর গেটে আমরা নামলাম। ভাড়া ও বখশিস নিয়ে টাঙাওয়ালা সেলাম ঠুকে চলে গেল। তারপর দেখি, উর্দিপরা চৌকিদার ছুটে এসে একেবারে মিলিটারি স্যালুট ঠুকল। তার মুখে বিস্ময় ছিল।

—কর্নিল সার! আপ? আইয়ে আইয়ে!

কর্নেল বললেন—কেমন আছ বৈজু?

সে একগাল হেসে বলল—ভাল আছি কর্নিলসার। তো কুছু খবর ভেজে তো আসবেন?

—কেন? ঘর খালি নেই?

—জরুর আছে। সে কর্নেলের পাশেপাশে হন্তদন্ত হাঁটতে থাকল। খালি আছে কোনো যদি পুছ করেন, অনেক বুরি রাত কর্নিলসাব। বজরঙ্গবলীজির মন্দিরে কয়রোজ বজরঙ্গবলীজি দরশন দিচ্ছেন। বাপরে বাপ! বলে সে একটা অদ্ভুত গল্প শুনিয়ে দিল।

বজরঙ্গবলীজি মানে স্বয়ং হনুমানজি। প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের সেবক। লম্বা চওড়া সাংঘাতিক চেহারা। ওখানে তাঁর প্রথম দরশন পায় ফরেস্টগার্ডরা। তারপর পাশের নদীতে মাছ ধরতে যাওয়া জেলেরা। একজন কণ্ট্রাক্টার কাঠ আনতে ট্রাক পাঠিয়েছিলেন। তাঁর লোকজন দরশন পেয়ে পালিয়ে আসে। শেষে ট্রাকটা নদীতে উল্টে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এখনও সাহস করে সেটা কণ্ট্রাক্টর তুলে আনতে পারেন নি। এলাকার সব বস্তি জুড়ে প্রচণ্ড আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। কেউ ভুলেও ওদিকে যাচ্ছে না। কে জানে কেন, হয় তো এতবছর মন্দির সংস্কার এবং পুজোআচ্চা না হওয়ায় হনুমানজি রুষ্ট হয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু পুজো দিতে যেতেও

কেউ ভরসা পাচ্ছে না। কাল বিকেলে কে নাকি সাহস করে পুজো দিতে গিয়েছিল। তাকে হনুমানজি দুহাতে তুলে আছাড় মেরেছেন। সে এখন হাসপাতালে আছে। 'কার্নিলসাব' হাসপাতালে গেলেই সব খবর পেয়ে যাবেন।

বাংলোর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের একটা ঘরে বসে বৈজুর মুখে এই অদ্ভুত কাহিনী শুনলাম। তারপর কর্নেল তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কফি, কৌটোর দুধ, চিনি এসব দিলেন। সে শিগগির কফি করে আনল। আমরা কফি খেতে খেতে আরও সাংঘাতিক কিছু ঘটনা শুনলাম। অবিশ্বাসী কারা গত রাতে মন্দিরে বজরঙ্গ-বলীজিকে দেখতে গিয়েছিল। বড় বড় করে ঢিল পড়তে শুরু করে। তারা পালিয়ে আসে। 'বাহারকা আদমি।' টাউনশিপে একটা হোটেলে উঠেছে। শুধু এটুকুই জানে বৈজু। কারণ সেই হোটেলের এক বেয়ারা তার ভাগ্নে।

কর্নেল হোটেলের নামটা জেনে নিলেন। তারপর বৈজুকে দুপুরের খাওয়ার জন্য জিনিসপত্র আনতে বাজারে পাঠালেন। সাইকেলে চেপে সে চলে গেল।

বললাম—ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ। অদ্ভুত তো বটেই। বোঝা যাচ্ছে, এ জন্যই কুঞ্জবাবু কথামতো টাকা রাখতে গিয়ে অসুবিধেয় পড়েছেন। পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। যাই হোক, তুমি জিরিয়ে নাও। ট্রেনে ঘুম হয়নি। আমি ততক্ষণ প্রকৃতিদর্শন করে আসি। একটা কথা, দরজা আটকে রাখো। অচেনা কাকেও দরজা খুলো না।

—সাবধান কর্নেল! হনুমানজির পাল্লায় পড়বেন।

কর্নেল হাসতে হাসতে ক্যামেরা, বাইনোকুলার আর প্রজাপতিধরা জাল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ট্রেনজার্নির ধকল সামলাতে আমি শুয়ে পড়াই উচিত মনে করলাম। দরজাটা অবশ্য আটকে দিতে ভুললাম না।

বজরঙ্গবলীর আবির্ভাব নিয়ে ভাবছিলাম। বৈজু তার চেহারার যে বর্ণনা দিল, তা কি সত্যি? নাকি নিছক রটনা? যোগীন্দ্র শর্মা

টাকা নিতে না আসা পর্যন্ত কি এই রটনা চলবে ?

আমি ভেবেই পেলাম না যোগীন্দ্রর দলবলের হাত থেকে অনাচার সাদা পোশাকের পুলিশ এবং কর্নেল কী ভাবে আত্মরক্ষা করবেন। ওরা পাথরের বা জঙ্গলের আড়াল থেকে গুলিও ছুঁড়তে পারে। আতঙ্কে আর ঘুম এল না। এলোমেলো চিন্তা পেয়ে বসল।

এখন স্পষ্ট বুঝতে পারছি, হরনাথ 'চোরাই মুক্তো' কর্নেলের সাহায্যে উদ্ধার করে শেখসায়েবকে নিশ্চয় খুন করতেন। যোগীন্দ্রের সঙ্গে বখরা হত। তবে কেসটার বৈচিত্র আছে বলতে হবে। প্রসাদজি এবং যোগীন্দ্র প্রথমে জোট বেঁধেছিলেন। শেখসায়েব টের পেয়ে যান হরনাথের কাছে। ধূর্ত যোগীন্দ্র তখন জোট বাঁধে হরনাথের সঙ্গে। তৃতীয় জোট ডঃ সুন্দরম এবং বনানীর। বিদেশী চর রবার্ট স্টিলার তাদের জোটের মূলে।

কিন্তু মিমির আচরণ বিস্ময়কর। সে ভালই জানে তার প্রেমিকও অন্যতম হত্যাকারী। শুধু কি প্রেমের খাতিরে সে মুখ বুজে ছিল, নাকি ভয়ে ?

দুটো কারণই থাকা সম্ভব। পক্ষপাতগ্রস্ত বৃদ্ধ জ্যাঠামশাইয়ের বিপদ হোক, এটাও সে চায়নি। ইন্দ্রজিৎ চিরবাউণ্ডুলে এবং পরমেশ তাকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু অভিজাত রক্তের প্রেসটিজ বলে কথা! তাঁরই বাড়িতে খুনখারাপি পরমেশের আঁতে ঘা দিয়েছিল। তাই কর্নেলের শরণাপন্ন হতে চেয়েছিলেন।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় কেউ কড়া নাড়ছে। অমনি উঠে বসলাম। কিটব্যাগ থেকে রিভলবার বের করে গুলি ভরে নিলাম। তারপর সাড়া দিলাম।

—কে ?

হালদারমশাইয়ের সাড়া পেয়ে অবাক হয়ে গেলাম। —জয়ন্তবাবু! জয়ন্তবাবু! দরজা খোলেন!

উঠে দরজা খুলে দেখলাম, মাথায় আর একহাতে ব্যাণ্ডেজবাঁধা প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন—ডিসটার্ব করলাম! ঘুমাইতেছিলেন নাকি ?

—আসুন! আসুন! আপনার জন্যই কর্নেল ছুটে এসেছেন

কলকাতা থেকে।

—হঃ! শুনলাম। বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ঘরে ঢুকলেন।

—কর্নেলস্যার হসপিট্যালে গেছিলেন। আপনি ফরেস্টবাংলোয় আছেন শুনলাম।

—আপনাকে নাকি বজরঙ্গবলীজি আছাড় মেরেছেন কাল বিকেলে? হালদারমশাই হি হি করে একচোট হাসলেন। তারপর বললেন— কেডা কইল? এক হালার ব্যাটারে মন্দিরে ফলো করছিলাম। স্লিপারি জায়গা! তারে ধরছি আর ধাক্কা দিচ্ছে আর আছাড় খাইয়া পড়ছি। নিজেই হসপিট্যালে যাইয়া ভর্তি হইছিলাম। এট্টুখানি চোট লাগছিল।

—কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

হালদারমশাই জোরে মাথা নাড়লেন।—নাহ্। কেমন ভদ্রলোক বুঝি না। তবে কর্নেলস্যার যহন আইয়া পড়ছেন, সেই হালারে ধইর‍্যা ফেলব।

—কে সে?

—বান্দরের মতন এইটুকখানি। তবে ভেরি ক্লেভার। পুলিশলাইফে অগো দেখছি। ছিঁচকে চোর যেমন হয়।

—ওকে ফলো করেছিলেন কেন?

—মন্দিরের কাছে ঘুরতাছিল হালা। আমারে দেইখ্যাই লুকাইয়া পড়ল। যাউক গিয়া! শুনলাম শ্যাখসায়েবের জুয়েল কর্নেলস্যার উদ্ধার করছেন। হরনাথবাবুর কথা জিগাইলাম। কইলেন, পরে সব জানতে পারব।

—কর্নেল কোথায় গেলেন?

—জানি না। আপনি আইছেন শুইন্যা আইয়া পড়লাম। বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ প্যান্টের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করলেন। নাকে নস্যি গুঁজে চেয়ারে হেলান দিলেন। তারপর হাই তুলে চোখ বুজলেন। জড়ানো গলায় বললেন—হসপিট্যালে ঘুম হয় নাই।

একটু পরে ওঁর ব্যান্ডেজ বাঁধা মাথা কাত হল এবং নাক ডাকতে থাকল।

কর্নেল ফিরলেন ঘণ্টাখানেক পরে। হালদারমশাইকে দেখে একটু হাসলেন। চাপা স্বরে বললেন—তত বেশি চোট লাগেনি। ইচ্ছে করেই হাসপাতালের বেডে ছিলেন। প্ল্যান ছিল, আজ সেই লোকটাকে ধরবেন।

বললাম কুঞ্জবাবুর সঙ্গে দেখা হল ?

—হ্যাঁ। ওঁদের পুলিশের জিপে আসানসোল পাঠিয়ে দিলাম। সেখান থেকে ট্রেনে কলকাতা ফিরে যাবেন।

—সে কী! যোগীন্দ্রকে তাহলে কী ভাবে ধরবেন ?

—যোগীন্দ্র শর্মা বজরঙ্গবলীর থানে যাবেই। টাকার লোভ ভীষণ লোভ। তার ধারণা, দাদাঅন্তপ্রাণ কুঞ্জবাবু টাকা থানে রাখবেনই। এক মিনিট! বৈজুকে খবর দিই একজন গেস্ট আছেন।

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। ডাকলাম—হালদারমশাই!

প্রাইভেট ডিটেকটিভ তড়াক করে সোজা হয়ে বসে বললেন—হালার বান্দর!

—হালদারমশাই, বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলুন।

—অ্যাঁঃ ? বলে হেসে উঠলেন হালদারমশাই।—কী কাণ্ড! স্বপ্ন দেখছিলাম।

—সেই লোকটার ?

—হঃ!...

দুপুরের খাওয়ার পর বারান্দায় বসে আমরা গল্প করছিলাম। হালদারমশাইই বেশি কথা বলছিলেন। কীভাবে হরনাথবাবু কিডন্যাপড হয়েছেন, সেই ঘটনা সবিস্তারে শোনালেন। কর্নেল মাঝেমাঝে বাইনোকুলার খুলে দূরের দৃশ্য কিংবা পাখি-টাখি দেখছিলেন।

একসময় জিজ্ঞেস করলাম—বজরঙ্গবলীজির মন্দির কোনদিকে ?

হালদারমশাই তাঁর লম্বা তর্জনী তুলে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ঘন জঙ্গল দেখিয়ে দিলেন। বললেন...তা প্রায় মাইল দুইয়ের বেশি।

বললাম—কর্নেল! আপনি নিশ্চয় বাইনোকুলারে দেখতে পাচ্ছেন ?

কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখেই হাসলেন।—পাচ্ছি। পুরনো আমলের একটা কেল্লার ধ্বংসস্তূপে জঙ্গলটা গজিয়েছে। কোনও

সামন্তরাজারই কেল্লা ওটা। গত মার্চে ওখানে একটা আশ্চর্য অর্কিড দেখেছিলাম। এখনও থাকা উচিত। খুব উঁচু জায়গা বলে সংগ্রহ করতে পারিনি।

—অর্কিডটা কি বাইনোকুলারে এখন দেখতে পাচ্ছেন ?

—হুঁ। এবং যোগীন্দ্র শর্মাকেও।

হালদারমশাই চমকে উঠলেন।—কী কইলেন কর্নেল স্যার ?

—যোগীন্দ্র শর্মা। না হালদারমশাই, ওর যে লোকটা আপনাকে ধাক্কা মেরেছিল, সে সঙ্গে নেই।

—যোগীন্দ্র শর্মা ? কেডা সে ?

—যে হরনাথবাবুকে কিডন্যাপ করেছিল।

হালদারমশাই লাফিয়ে উঠলেন।—হালারে এখনই গিয়া ধরব।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—যথাসময়ে আমরা বেরুব। ব্যস্ত হবেন না। চোরডিহার পুলিশ আসুক। পুলিশই যোগীন্দ্রকে আইনত অ্যারেস্ট করতে পারে। আমরা কে !

বললাম—এখনই চলে গেছে যোগীন্দ্র ?

—তাই তো দেখছি। আগে থেকে ওত পাততে গেছে। অসম্ভব ধূর্ত লোক। কাজেই পুরো কেল্লাবাড়ির জঙ্গল না ঘিরে ফেললে ওকে ধরা যাবে না।

—বোঝা যাচ্ছে, হনুমানজির আবির্ভাবের ঘটনা তার চেলাদের দিয়ে রটিয়ে রেখেছে। —ঠিক ধরেছ।

সময় কাটছিল না। বিকেলে পুলিশের জিপ এল। একজন অফিসার এসে কর্নেলের সঙ্গে আড়ালে কী সব পরামর্শ করে চলে গেলেন। তারপর বৈজু কফি নিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল, কোনও ‘খতরনাক’ ঘটেছে কিনা। কর্নেল তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন. নাহ্। খতরনাক ঘটলেও তার চিন্তার কারণ নেই।

পাহাড়ের আড়ালে সূর্য নেমে গেলে নীচের উপত্যকায় ধূসরতা ঘন হতে থাকল। তখন কর্নেল উঠলেন।—এস জয়ন্ত ! হালদারমশাই কি যেতে চান ? আপনি তো এখনও সুস্থ হননি।

—কী যে কন কর্নেলস্যার ! বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ উঠে দাঁড়ালেন।—এমন ড্রামাটিক মোমেণ্টে আমি প্রেজেন্ট থাকব না ?

আমরা বাংলোর উল্টোদিকের গেট দিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেলাম। তারপর কর্নেলকে ঝোপ জঙ্গল পাথরের ভেতর দিয়ে অনুসরণ করলাম। কিছুক্ষণ পরে একটা ছোট্ট নদীর বাঁকে গিয়ে কর্নেল বললেন—সাবধান! ঝোপের কিংবা পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগোতে হবে। লোকটার হাতে ফায়ার আর্মস থাকতে পারে।

নদীর ধারে কেল্লাবাড়ির ধ্বংসস্তূপ আবছা আঁধারে কালো হয়ে দেখা যাচ্ছিল। একটু পরে সামনে ফাঁকা জায়গা এবং একটা ভাঙা মন্দিরের উঁচু চত্বর অস্পষ্ট ভেসে উঠল। কর্নেল আমাদের চুপচাপ বসে থাকতে বলে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলেন। তারপর আর তাঁকে দেখতে পেলাম না।

ক্রমশ আঁধার ঘন হচ্ছিল। এক সময় হঠাৎ টর্চের আলো জ্বলে উঠল। কেউ পায়ের কাছে আলো ফেলে চত্বরে উঠে গেল। তারপর দেখি, সে একটা ব্রিফ কেস চত্বরে রেখে নেমে এল এবং বেমক্কা হিন্দি ফিল্মের গান গাইতে গাইতে ওপাশে উধাও হয়ে গেল।

কী ব্যাপার বোঝা যাচ্ছিল না। একটু পরে চত্বরের ওপর আবার টর্চের আলো জ্বলে উঠল। কেউ এগিয়ে এসে ব্রিফকেসটার কাছে বসল। আলোটা সে জেলে রেখেছে। তাই দেখতে পেলাম, সে ব্রিফকেসটা খুলে ফেলল। খুলেই সে চাপা গর্জন করল—শালে ধোকেবাজ! তারপর আছাড় মেরে ফেলে দিল ব্রিফকেসটা।

এতক্ষণে কর্নেলের সাড়া পেলাম।—যোগীন্দ্র শর্মা! হ্যাণ্ডস আপ! য়ু আর সারাউণ্ডেড।

অমনি আলো নিভে গেল এবং গুলির শব্দ হল কয়েকবার। তারপর চারদিক থেকে টর্চের আলো ঝলকে ঝলকে এসে ছড়িয়ে পড়ল। যোগীন্দ্র শর্মার রিভলবারের গুলি শেষ হয়ে গেল বোঝা গেল। সে দু'হাত তুলে ভাঙা গলায় আর্তনাদ করে উঠল—আই সারেণ্ডার! হালদারমশাই বেরিয়ে গিয়ে চিৎকার করলেন—হেই বান্দরটা কৈ গেল? পুলিশ যোগীন্দ্র শর্মাকে ততক্ষণে ধরে ফেলেছে। কর্নেল হালদারমশাইকে বললেন—আপনাকে যে ধাক্কা দিয়েছিল, তাকে পুলিশ খুঁজে বের করবে হালদারমশাই! চলুন, বাংলোয় ফেরা যাক।...

উপসংহার

পরদিন বিকেল নাগাদ আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। হালদারমশাই তাঁর ডেরায় চলে গেলেন। কর্নেল আমাকে বাড়ি ফিরতে বললেও সঙ্গ ছাড়তাম না। ইরাকের গোপন রাসায়নিক অস্ত্রকারখানার ম্যাপটা দেখার তীব্র ইচ্ছা ছিল।

অ্যাপার্টমেণ্টে পেঁছে কর্নেল তাঁর প্রিয় পরিচারক ষষ্ঠীচরণের কাছে জানতে চাইলেন, কেউ এসেছিল বা ফোন করেছিল কিনা। ষষ্ঠীচরণ বলল—কেউ আসেনি বাবামশাই। তবে একজন ফোং করেছিল বটে।

—নাম বলেনি?

ষষ্ঠী তার স্বভাবমতো কান চুলকে বলল—কি বলল যেন। পেটে আসছে মুখে আসছে না।

—পুরুষ না মহিলা?

—আজ্ঞে, মেয়েছেলে। আমি বললাম, বাবামশাই বেইরেছেন।

কর্নেল কপট চোখ কটমটিয়ে বললেন—কফি। শিগগির!

সে বেজার মুখে চলে গেল। বললাম—বনানী ছাড়া আর কে ফোন করবে?

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—অর্থলোভ সবচেয়ে সাংঘাতিক লোভ। জানি না রবার্ট স্টিলার নামে এক বিদেশি এজেণ্ট ওদের ঠিক কত টাকা দিতে চেয়েছে। তবে টাকার অঙ্কটা খুব বেশি হওয়াই উচিত।

একটু হেসে বললাম—এবার আপনার সামনে বড় সুযোগ। নাহ্ বস্! আমি কমিশন দাবি করব না। কারণ আমি চাই অমন একটা মানবতাবিরোধী ভয়ংকর অস্ত্রকারখানা, ধ্বংস হয়ে যাক্।

কর্নেলও হাসলেন।—ঠিক বলেছ ডার্লিং! মানবতাবিরোধী কথাটা অসাধারণ। কাজেই ওই গুপ্তচর আমার কাছে এলে আমি ওটা তাকে বিনিপয়সায় দান করতে রাজি।

উৎসাহ দেখিয়ে বললাম—তা হোটেল কণ্টিনেণ্টালে ওকে ফোন

করুন।

—করব। কফি খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিই।

ষষ্ঠী কফি আনতে দেরি করল না। কফি খাওয়ার পর কর্নেল টেলিফোন তুলে ডায়াল করলেন। একটু পরে বললেন—সুইট নাম্বার টু জিরো ফোর। রবার্ট স্টিলার।··· কী? চেক আউট করেছেন? কখন?···ঠিক আছে।

ফোন নামিয়ে কর্নেল বললেন—গুপ্তচররা বেশি সময় এক জায়গায় থাকে না।

বললাম—ইস! কী চান্সটা ও মিস করল!

—হয়তো আমাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। ভেবেছে ওকে ধরিয়ে দেব এবং ম্যাপটা আমি ভারত সরকারের হাতে তুলে দেব। সরকার এই কার্ড পেলে বিশ্বব্যাঙ্ক আই এম এফ থেকে প্রচুর ঋণ আদায় করতে পারবেন।

এই সময় টেলিফোন বাজল। কর্নেল সাড়া দিয়ে চললেন—হ্যাঁ। ···কী ব্যাপার মিমি?···হ্যাঁ, বাইরে গিয়েছিলাম। এইমাত্র ফিরেছি।···হ্যাঁ, দাও জ্যাঠামশাইকে। ···বলুন পরমেশবাবু।··· গোরকে অ্যারেস্ট করেছে? ভাল খবর।···বুঝেছি। আপনার আগ্রহ স্বাভাবিক।···ঠিক ধরেছেন। জুয়েলস উদ্ধার করেছি।···দেখতে চান?···হাঃ হাঃ হাঃ। রহস্য কী ভাবে ফাঁস হল?···ঠিক আছে। যাচ্ছি। মুখোমুখি সব শুনবেন। ছাড়ছি।

কর্নেল টেলিফোন রেখে সহাস্যে বললেন—চলো জয়ন্ত! পরমেশ রায়চৌধুরি আমার মক্কেল। কাজেই তাঁকে আগাগোড়া সবটা জানানো দরকার।

বললাম—ম্যাপটা তাঁকে দেখাবেন নাকি?

—দেখানো উচিত। তা না হলে ভাববেন ওঁর ভাইপোর 'মুক্তো-গুলো' আমি মেরে দেবার তালে আছে। ওঁকে জানানো উচিত, ইন্দ্রজিৎ মুক্তো চুরি করে আনেনি। এনেছিল একটা ম্যাপ।

—কিন্তু কর্নেল, সঙ্গে ওটা নিয়ে বেরুনো ঠিক হবে কি? ছবিটা হাতে বা কিটব্যাগে করে নিয়ে বেরুলে যদি ছিনতাই হয়ে যায়? রবার্ট স্টিলারের গুণ্ডারা ওত পেতে থাকতে পারে।

কর্নেল হাসলেন।—ম্যাপটা ভাঁজ করা আছে। পকেট থেকে কেউ ছিনতাই করতে হলে তারই বিপদ। আমাকে ধরাশায়ী করা সহজ হবে না। তাছাড়া তুমি সঙ্গে আছ। ফায়ার আর্মস রেডি থাকছে।
উনি ঢুকে গেলেন। আমি রিভলবারটা রেডি করে পকেটে রাখলাম। একটু পরে কর্নেল বেরিয়ে এসে বললেন—চলো! একটা ট্যাক্সি করে নেব।
বরাবর দেখে আসছি, কর্নেলের পাদ্রিবাবার মতো অমায়িক চেহারার জন্য হোক বা যে কারণেই হোক, ট্যাক্সিড্রাইভাররা ওঁকে না করতে পারে না। তা না হলে এই ভরসন্ধ্যায় পিক আওয়ারে ট্যাক্সি পাওয়া অসম্ভব ছিল।
শর্টকাটে যেতে ট্যাক্সিড্রাইভার আপত্তি করল না। তাকে ভাড়া এবং টিপস দিয়ে খুশি করে কর্নেল গলিরাস্তায় এগিয়ে গেলেন। তাঁর দেহরক্ষীর মতো চারদিকে লক্ষ্য রেখে অনুসরণ করলাম।
মধু আমাদের অপেক্ষা করছিল। গেট খুলে একগাল হেসে বলল—গৌরকে আজ ভোরবেলা পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে স্যার! ওর সাগরেদরা ভয়ে পাড়া থেকে পালিয়েছে। পাড়ার লোকে খুব খুশি।
জঙ্গলে লনে হাঁটতে হাঁটতে সে ফের চাপা স্বরে বলল—আজও দুপুরবেলায় সেই সায়েব এসেছিলেন। কর্তামশাই কিছুতেই দেখা করবেন না। সায়েবের এক কথা, জরুরি দরকার আছে। বুঝিয়ে বলো। শেষে মিমিদিদি গিয়ে রাজি করালেন। সায়েবকে নিয়ে গেলাম।

কর্নেল বললেন—তারপর?
—খানিক পরে সায়েব বেরিয়ে গেলেন।
বললাম—লোকটা ধরেই নিয়েছে এ বাড়িতেই কোথাও ইন্দ্রজিৎ জিনিসটা লুকিয়ে রেখেছে। তাই আবার লোভ দেখাতে এসেছিল।
কর্নেল কোনও মন্তব্য করলেন না। মধু আমাদের ওপরে পেঁছে দিয়ে চলে গেল। কর্নেলকে দেখে পরমেশ খুশিমুখে বললেন—আসুন! আসুন! গৌর হারামজাদাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। থানায় ফোন করে শুনলাম, ওর খুনে সাগরেদরাও ধরা পড়েছে।

কিন্তু স্পষ্ট করে কিছু বলল না।

বলে হাঁক দিলেন—মিমি! আলো জেবলে দে। আর কর্নেল সায়েবের জন্য কফি নিয়ে আয়।

মিমিকে বিবর্ণ পুতুল দেখাচ্ছিল। সে চুপচাপ সুইচ টিপে আলো জেবলে দিল। তারপর কফি করতেই যাচ্ছিল। কর্নেল বললেন—এখন নয় মিমি! একটু পরে কফি খাব। এইমাত্র খেয়ে বেরিয়েছি। তুমি বসো।

পরমেশ উজ্জবল মুখে বললেন—জুয়েল উদ্ধার কোথায় করলেন?

—বনানীদের ঘরে।

—অ্যাঁ! ওই মেয়েটার কাছে রেখে গিয়েছিল ইন্দ্র? নির্বোধ কোথাকার। কৈ, দেখি! দেখি!

—দেখাচ্ছি। তো আজও নাকি রবার্ট স্টিলার এসেছিলেন?

পরমেশ বিকৃত মুখে বললেন—হ্যাঁ। টাকার লোভ দেখাচ্ছিল। লোভ কী বলছি? ব্যাগভর্তি একশো টাকার নোটের বান্ডিল। শেষে বলে, ব্যাটা নিজেই বাড়ি খুঁজে দেখবে, যদি অনুমতি দিই।

মিমি কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। বলল না। কর্নেল বললেন—যাই হোক। আগাগোড়া ঘটনাটা আপনি জানতে চেয়েছেন। বলি শুনুন।

পরমেশ বললেন—বলুন! শোনা যাক।

কর্নেল ইন্দ্রজিতের পালিয়ে আসার আগে থেকে শুরু করলেন। এই কাহিনীর সবটাই আমার জানা। দীর্ঘ কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে পরমেশ মন্তব্য করে যাচ্ছিলেন নানারকম। হত্যাকান্ডের রাতে মিমির গৌরকে দরজা খুলে দেওয়া বা এই কাহিনীতে তার ভূমিকাটা সাবধানে এড়িয়ে গেলেন কর্নেল। তারপর চোরাডিহাপর্ব শেষ করে বললেন—আপনি জুয়েলস দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু পরমেশবাবু, ইন্দ্রজিৎ বাহারিন থেকে মুক্তো চুরি করে আনেনি। চোরাই মুক্তো আসলে একটা ম্যাপ!

পরমেশ চমকে উঠলেন।—ম্যাপ! কিসের ম্যাপ?

—ইরাকের গোপন রাসায়নিক অস্ত্রকারখানার।

—কী সর্বনাশ! বনানীদের বাড়িতে ওটা লুকোনো ছিল?

—একটা মরুভূমির বাঁধানো ছবির পেছনে।

পরমেশ গুম হয়ে বললেন—হুঁ। এবার কফি খান। মিমি! শিগগির কফি করে আন। আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। এ যে গোয়েন্দা উপন্যাসের চেয়ে রোমাঞ্চকর। কল্পনা করা যায় না।

মিমি বেরিয়ে গেল কফি করতে। একটু পরে পরমেশ শ্বাস ছেড়ে বললেন—ম্যাপটা কী করবেন ভাবছেন?

কর্নেল বললেন—আমাদের গভমেণ্টের হাতে তুলে দেব ভাবছি।

পরমেশ একটু হেসে বললেন—ঠিক বলেছেন। ওসব সাংঘাতিক ব্যাপার গভমেণ্টের হাতে তুলে দেওয়াই উচিত। তা ম্যাপটা কি আপনার কাছে আছে? আমার দেখতে আগ্রহ হচ্ছে।

কর্নেল ভেতর পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা বেরঙা কাগজ বের করে খুললেন। আমিও ঝুঁকে পড়লাম। সাধারণ কাগজে আঁকা কিছু রেখা আর বিন্দু। কর্নেল বললেন—আরবি লেটারে সাংকেতিক কী সব লেখা আছে।

পরমেশের একটা হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত। অন্য হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখি। একসময় আমি লখনৌতে ছিলাম কিছুদিন। এক বন্ধুর কাছে উর্দু শেখার চেষ্টা করেছিলাম। উর্দু লেটার নাকি আরবি। দেখি পড়তে পারি নাকি।

কর্নেলের হাত থেকে ছোট্ট ম্যাপটা উনি নিলেন। তারপর টেবিলে চাপা রেখে টেবিল ল্যাম্প জেবলে দিলেন। ঝুঁকে পড়লেন ম্যাপের ওপর। বিড়বিড় করে কী দুর্বোধ্য শব্দ আওড়াতে থাকলেন। শেষে বললেন—অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ মনে হচ্ছে। আমি লেটার একটু-আধটু চিনলেও সংখ্যা চিনি না। এই রেখাটা সম্ভবত নদী। আর এই রেখাটা পাহাড়।

এই সময় মিমি কফির ট্রে এনে টেবিলের একপাশে রাখল। সে কর্নেল এবং আমার হাতে কফির পেয়ালা তুলে দিল। পরমেশকে সে কফির পেয়ালা দিতে যাচ্ছে, তখন পরমেশ ম্যাপের ওপর ঝুঁকে ছিলেন। মিমি বলল—জ্যাঠামশাই! কফি!

—হুঁ। দে। বলে ম্যাপে দৃষ্টি রেখে পরমেশ হাত বাড়ালেন।

এইসময় আচমকা ঘটনাটা ঘটে গেল।

মিমি কফির পেয়ালা পরমেশের হাতে দিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এক-মুহূর্তের ব্যবধান ছিল কফি দেওয়া এবং নেওয়ার মধ্যে। কফির পেয়ালাটা উল্টে পড়ে গেল ম্যাপের ওপর। পরমেশ চিৎকার করলেন—ওই যাঃ!

আমিও হাঁ হাঁ করে উঠেছিলাম। ম্যাপটা ভিজে কালি ধেবড়ে গেছে এবং পুরোটাই নষ্ট হয়ে গেছে। ঘুরে দেখলাম কর্নেল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছেন।

পরমেশ রুষ্ট মুখে বললেন—আমার এই হাতটা! হাতটা প্রায় স্লিপ করে। দুঃখিত। এই হাতটা আর কেন আছে? অন্যটার মতো এটাও শেষ হয়ে যাওয়া উচিত। হারামজাদা শুওরের বাচ্চা হাত! একটা মাত্র হাত!

মিমি দ্রুত চলে গেল ঘর থেকে।

কর্নেল কফির পেয়ালা মেঝেয় রেখে তেমনি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন—পরমেশবাবু! রবার্ট স্টিলার কত টাকা দিয়ে গেছে আপনাকে?

—এ কী বলছেন আপনি? পরমেশ নড়ে বসলেন।—এটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট ছাড়া কিছু নয়।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে এতদিনে সত্যিই বাহাত্তুরে ধরেছে। তাই এই ফাঁদে পড়ে হার মানতে হল। জীবনে এই প্রথম হার। আপনার ওই একটা হাতের প্যাঁচে আমি জব্দ হয়ে গেলাম।

—আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না!

—পারছেন পরমেশবাবু। রবার্ট স্টিলার আপনার ওই একটামাত্র হাতকে কাজে লাগিয়ে গেছে। আজ সে এসেছিল শুধু এই উদ্দেশ্যই। সে যা-যা বলেছিল, আপনি ঠিক তা-ই করেছেন। ডেলিবারেট প্ল্যান।

এবার পরমেশ বাঁকা হাসলেন।—কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন। ইন্দ্র আমার ভাইয়ের ছেলে। ম্যাপটা তাই আমার। ওটা নিয়ে যা খুশি করতে পারি।

কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। ওঁকে অনুসরণ করলাম। সিঁড়িতে নামার সময় বললাম—আমি কিছু বুঝতে পারছি না কর্নেল।

কর্নেল প্রায় চাপা গর্জন করলেন।—ইউ ফুল! বুঝতে পারছ না রবার্ট স্টিলার একজন ডাবল এজেণ্ট? ম্যাপটা যেভাবে হোক হাতাতে কিংবা প্রয়োজনে নষ্ট করে ফেলার জন্যই সে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল। ম্যাপটা পেলে সে মার্কিন জোটকে বেচে প্রচুর টাকাকড়ি পেত। আবার নষ্ট করে দেওয়ার জন্যও সে ইরাকের কাছে প্রচুর টাকাকড়ি পাবে। ডাবল এজেণ্টরা এরকমই করে।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার গলিরাস্তায় আমরা দুজনে চুপচাপ হেঁটে গেলাম। সত্যি তো! ইন্দ্রজিতের চুরি করে আনা ম্যাপটা নিয়ে তার জ্যাঠামশাই যা খুশি করতেই পারেন। আইনতই পারেন। আমরা কিছু বলার কে?…